কবির বন্ধু

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সিগনেট প্রেস । কলকাতা ২০

রুনু, ঘুলি আর পুপে-কে

ঠিক হল মিমুনের জঙ্গলে শিকারে যাওয়া হবে। হৈ-হল্লা তোড়জোড় চলল কদিন ধরে। জামাইবাবু আর আমাদের পাশের বাড়ির জেফরসনসাহেব কোর্ট-কাচারি ফেলে লিস্ট বানাতে বসলেন — কি-কি সঙ্গে নেওয়া যায়, কি পরে যাওয়া যায় ইত্যাদি।

আমি তখন নেহাত কচিও নয় আবার বড়োও নয় বিশেষ। রাগ হলে ঠাকুমা বলতেন, 'তেরো বছর বয়েস হয়ে গেল, সেকালে হলে সংসার করতে হত, তা শুধু ধিঙ্গিপনা ছাড়া আর কিছু শিখলিনে? বাপ ওভাবে আদর দিলে মেয়ের কিছু হয়?' কিন্তু মেজাজ ভালো থাকলেই আবার অন্য সুর, 'আহা, মা-মরা মেয়েটা! এই তো সবে এগারোয় পা দিয়েছে, তা এই বয়েসে কি ঝক্কিই না যাচ্ছে ওর ওপর দিয়ে!' কাজেই বেশ বোঝা যাচ্ছে আমার বয়েস তখন বারো।

'সাজ, সাজ' রব দেখে আমি বায়না ধরলাম — 'যাবো।' জামাইবাবু বেশির ভাগ সময়ই একটু মুখভঙ্গি করে কথা বলতেন। মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'শিকারে যাচ্ছি, সঙ্গে মেয়েমানুষ নিয়ে মরব নাকি?' আমিও হাত নেড়ে জামাইবাবুর দেখাদেখি মুখ-চোখ কুঁচকিয়ে জবাব দিলাম, 'আমি তো আর মেয়েমানুষ নয় — মেয়ে।'

কথাটা শুনে জামাইবাবু বিড়বিড় করে ইংরিজিতে অনেক কথা বলে গেলেন। আমি বিশেষ কিছুই বুঝতে না পেরে, উনি থামতেই বললাম, 'কি যে বলছ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছিনে।'

লিস্টে কি সব আঁক-জোক কাটতে-কাটতে জামাইবাবু বলে উঠলেন, 'পথে নারী বিবর্জিতা — জানিস?'

আমি অত সহজে কাবু হবার পাত্রী নই। বললাম, 'নারী তো দিদি, আমি তো কন্যা — বইতে লিখেছে।'

জামাইবাবু এবার হো-হো করে হেসে উঠে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'ও বীণা, শুনে যাও তোমার বোন কি বলছে।' দিদি পাশের ঘরেই ছিল। আমার কথা নিয়ে ওঁরা তিনজনে খুব হাসাহাসি জুড়ে দিলেন।

এত হাসবার কি আছে বুঝলাম না। রাগে গা রিরি করে জ্বলতে লাগল। জেফরসন আমার দিকে আঙুলটা উঁচিয়ে বললেন, 'মিনিকে শিকারে নিতেই হবে। ও যেরকম চালাক দুদিনেই শিখে নেবে।'

দিদি অমনি বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'চালাক হলে কি হয় পিঁপড়ে পর্যন্ত মারতে পারে না।'

আমি এসব কথা গায় মাখছিলাম না। মনে হচ্ছিল এসব বাজে কথার চালে আমাকে আসল কথাটা ভুলিয়ে দেওয়া আসলে ওঁদের মতলব।

ঘাড় গোঁজ করে গোমড়া মুখে বলে উঠলাম, 'ওসব বাজে কথায় ভুলছিনে। জিল্ তো নারী, তবু তো ওকে নেওয়া হচ্ছে।'

জিল্ হল জ্যাক্-এর বউ। জামাইবাবুর এ্যালসেশিয়ান কুকুরের জুড়ি। আমার কথা শুনে জিল্ জামাইবাবুর পায়ের কাছ থেকে মাথাটা তুলে একবার আমায় দেখে নিল। ভাবখানা—'আমায় আবার এর মধ্যে টানা কেন বাবা!' জ্যাক্ ঘুমন্ত চোখটা খুলে মণি দুটো ঘুরিয়ে আমায় দেখল মাত্র। ওরও মনের কথাটা যেন—'হিংসুটি হওয়া ভালো নয়!'

জামাইবাবু দু-একবার ওজর-আপত্তি তুললেন। কিন্তু জেফরসন বারবার বলতে লাগলেন, 'না, মিনি যাবে। তাছাড়া এ জঙ্গলটা খুব গভীর নয়। ভয়ের কোনো কারণ নেই।' শুনে আমি দমে গিয়ে বললাম, 'তাহলে গভীর জঙ্গলে গেলেই হয়।'

দিদি ধমকে উঠল, 'থাক্-থাক্, আর গভীর জঙ্গলে যায় না!' তারপর একটু থেমে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, 'আমিও যাব।'

দিদি শিকারে যেতে চায় শুনে জামাইবাবু এমন চমকালেন যে জ্যাক্ বিপদের আশঙ্কা করে রীতিমতো লাফিয়ে উঠে একবার ডেকে উঠল।

সদলবলে যাওয়া হবে ঠিক হল। সকলের মেজাজই ভালো থাকল কদিন। ফলে হৈ-হুল্লোড়ে পাড়া একেবারে মাত।

— দুই —

তখনো যুদ্ধ বাধেনি। মান্দালয় শহরে সিভিল লাইন্স-এর গা বেয়ে যে মস্ত চ্যাটাল রাস্তা — মেমিও রোড, তার ওপর রাত্তিরের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বড়ো-বড়ো লরি বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র চীনের সীমানার দিকে সবে যাওয়া-আসা শুরু করেছে। অনেক রাত্তিরে আচমকা ভাঙা ঘুমের মধ্যে বুক দুরদুর করে উঠত। ভারি-ভারি মাল-লরিগুলোর চলার ধাক্কায় মাটি কাঁপত। কাঠের বাড়িগুলো ঝনঝন করে ঝাঁকানি খেয়ে, শব্দ মেলাবার সঙ্গে-সঙ্গে আবার স্থির হয়ে বসতে না-বসতেই আরো লরি দেখা দিত। তারাও ঝাঁকানি দিয়ে চলে যেত। এমনি সারারাত।

লোকে বলাবলি করত শিগগির যুদ্ধ বাধবে। অথচ বর্মীদের বেপরোয়া চলাফেরা দেখে মনে হত যুদ্ধটা তাহলে বোধহয় 'যুদ্ধ-যুদ্ধ' খেলাই। সাহেবরা, বাঙালীরা আর অন্যান্য ভারতীয়রা কিন্তু ভয়ে হিম-সিম খেয়ে গেল। তাদের বাড়ির মেয়ে আর বাচ্চাদের দেশে পাঠাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে যেতেই তারা একেবারে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে ভয় দেখিয়ে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু জেফরসন আর জামাইবাবুর এসব নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই ছিল না। জামাইবাবু বলতেন, 'দাঁড়াও বাবা, কোর্টের ওপর আগে বোমা

পড়ুক তারপর নড়বার কথা ভাবব।' জেফরসন শুধু তাচ্ছিল্য করে একটু হাসতেন। কিচ্ছু বলতেন না। ভদ্রলোকের ছিল আটটা কুকুর—নানা জাতের, নানা বয়েসের, নানা সাইজের। একা-একা এদের নিয়ে বেশ থাকতেন জেফরসন। বন্ধুর মধ্যে কেবল জামাইবাবু আর সামনের বাড়ির বর্মী ভদ্রলোক উ-বা-টিন। প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় ওঁরা বাজি রেখে তাস খেলতেন কিম্বা শিকারের প্ল্যান করতেন।

পাড়ায় কুকুর পোষার বাতিক ছিল ঢের লোকের কিন্তু সাধ্যি কি তাদের জামাইবাবুর সঙ্গে পেরে ওঠে। বাড়ি না চিড়িয়াখানা বোঝা ভার। চোদ্দটা কুকুর, তিনটে বেড়াল, দুটো খরগোশ, একটা বাঁদর, দুটো টিয়া আর কিছু মুরগিতে বাড়ি, বাগান, খাঁচা সব সময় সরগরম। এদের পেছনে দুটো চাকর টো-টো করে সারাদিন ঘুরছে। একজন তো কেবল কুকুরের এঁটুলি মেরে-মেরেই কশাইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল।

আমার জামাইবাবুটি যে কি অদ্ভুত মানুষ তা অবশ্য বিয়ের সময়েই বোঝা গিয়েছিল। দিব্যি লম্বা-চওড়া সুন্দর চেহারা। কিন্তু কথাবার্তা শুনে বাবার তো চক্ষুস্থির। বিয়েতে কোনো দাবি-দাওয়া আছে কিনা জিগগেস করায় জামাইবাবু একটু মাথা চুলকে বলেছিলেন, 'সোনাদানা ফার্নিচার? ছ্যাঃ, ওসব কি হবে? যদি নেহাত কিছু দিতে চান তো জার্মানী থেকে পুলিশ-ট্রেইন্‌ড্‌ একজোড়া এ্যালসেশিয়ান কুকুর আনিয়ে দেবেন।'

কিন্তু বাবা তো আর শুধু এইটুকু দাবির জন্যে বিয়েও ভেঙে দিতে পারেন না আর দানসামগ্রীর জায়গায় একজোড়া কুকুরের গায় মন্ত্র পড়তে দিতেও পারেন না। তাই কুকুর সমেত বেশ দুপয়সা খসে গেল। জার্মানী থেকে অনেক লেখালিখি করে এল ইয়া বড়কা দুটো এ্যালসেশিয়ান কুকুর।

ঠাকুরদা আর ঠাকুমা কাণ্ড দেখে কালীঘাটে পুজো দিতে গেলেন। আর আমি দু-চারটে জার্মান কথা শিখে নিয়ে ওদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললাম।

বিয়ের দিন না-দেখার ভান করে দিদির শ্বশুর-শাশুড়ী সোনাদানা পরখ করলেন চোখ দিয়ে আর জামাইবাবু দেখলেন জ্যাক্ আর জিল্-এর বংশপরিচয় দেওয়া সার্টিফিকেটখানা। সব মিলেজুলে বিয়েটা বেশ ভদ্রভাবেই হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ জামাইবাবু বাসরঘর থেকে জার্মান ভাষায় কি একটা বলে চেঁচিয়ে উঠতেই জ্যাক্ আর জিল্ উত্তেজিত হয়ে এমন চেঁচামেচি জুড়ে দিল যে বিয়েবাড়িতে হুলস্থূল পড়ে গেল। জামাইবাবু মওকা পেয়ে বাসরঘর থেকে উঠে ওদের শান্ত করতে গেলেন। ছ-সাতটা ভাষা জানতেন। কুকুর বেড়াল পশুপক্ষী বশ করার পক্ষে তাই-ই যথেষ্ট বলতে হবে।

ব্যাপার দেখে বিয়েবাড়ি সুদ্ধু লোক তো একেবারে থ। দিদি আঁচলে দুবার চোখও মুছেছিল মনে আছে। কিন্তু জামাইবাবুর এসব কিছুই খেয়াল ছিল না। ছড়ানো কড়ি, ধান কুড়োতে-কুড়োতে মেজোপিসিমা বললেন, 'এমন কাণ্ড সাতজন্মে দেখিনি বাপু!' অনেকে গা টেপাটিপি করে হাসতে লাগল। কেউ-কেউ তো খোলাখুলি বলেই ফেলল, 'হাজার হোক বর্মী তো—নামেই বাঙালী।' ইষ্টনাম জপ করতে-করতে ঠাকুমা ঠাকুরঘরে অনেকগুলো প্রণাম ঠুকে এলেন। ঠাকুরদা যেন কিছুই হয়নি ভাব করে এক বুড়োর সঙ্গে জমাতে চেষ্টা করে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন। বাবা কিছু জানতেই পারেননি। অতিথিদের আপ্যায়ন করছিলেন। পরে শুনে গুম হয়ে গিয়েছিলেন। দাদাটা কুকুরের ডাক আর চেঁচামেচি শুনে পরিবেশন ছেড়ে এঁটো হাতে ছুটে এসেছিল, 'কি হল,

কি হল?' খবর জেনে বলল, 'এই? এ নিয়ে এত হৈচৈ করে লাভ কি?'

শুধু আমিই সেদিন অবাকও হইনি, বিরক্তও হইনি। জামাইবাবু বললেন, 'এই শোনো। তুমি তো মিনি—না? আমার শালী! একটু জল এনে দাও তো কুকুর দুটোকে। লক্ষ্মীটি! পারলে রুটিও এনো। বেচারি-দের খিদে পেয়েছে।' আমি পরম ভক্তের মতো ঘুরঘুর করে জামাইবাবুর ফাইফরমাশ খাটতে লাগলাম। আর দিদি বেচারি মন খারাপ করে বাসর-ঘরে বসে থেকে-থেকে হয়রান হয়ে গেল। বাসর থেকে দেখা যায় এমন জায়গায় কুকুর দুটোকে বেঁধে হাসিমুখে জামাইবাবু বাসরঘরে ঢুকেই বললেন, 'গান হোক।' হাওয়া তক্ষুনি গেল পাল্টে। আবার সবাই হাসছে। কেবল দিদিটা চিরদিনের মতো কুকুরজাতির শত্রু হয়ে রইল।

এর প্রায় দিন পনেরো পরে দিদি যখন এক গা গয়না পরে, একধারে জামাইবাবু আর দুধারে দুটো পেল্লায় বড়ো কুকুব নিয়ে বর্মাব জাহাজে চড়ে বসল তখন আমি ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠতেই জ্যাক্-এর কান লাফিয়ে উঠলো, জিল্ জমি শুঁকতে লাগল আর বাবা মহা ফ্যাসাদে পড়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'ওরকম কবে কাঁদিসনে। প্রতুল শেষে তোকে যৌতুক-চেয়ে বসবে জ্যাক্ আর জিল্-এর সঙ্গে।' আমি কান্নার আওয়াজ একটু সংযত করে নিয়ে বললাম, 'বাবা আমি বিয়ে করব, যৌতুক চাই—কুকুর।' বাবা হেসে ফেলে মাথা চাপড়ে 'পাগলি!' বলে আদর করলেন। তারপর দিদিকে চুমো খেয়ে নেমে এলেন জেটিতে।

বাড়ি ফিরে আমাদের সে কি মন খারাপ! দিদি নেই, জ্যাক্ জিল্ নেই, বিয়েবাড়ি নেই! লন্ডভন্ড জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে বাবার মনটা কি রকম এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। বললেন, 'পাগলের হাতে মেয়েটাকে সঁপে দিলাম। কি হবে কে জানে!'
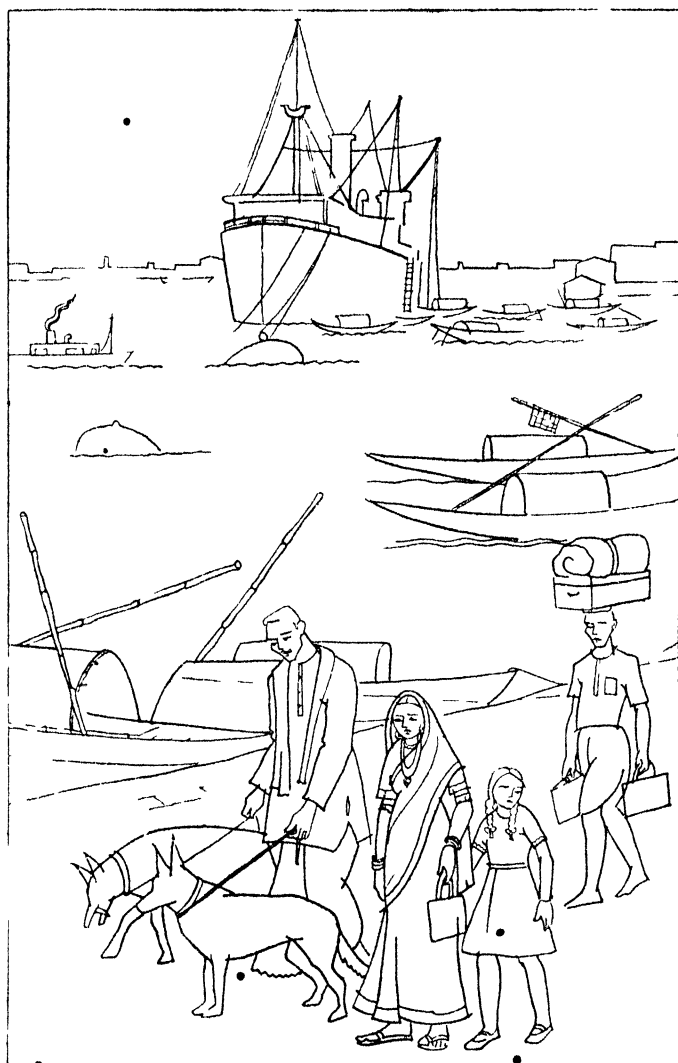
দিদির বিয়ের ঠিক দু'বছর পরে বাবা হঠাৎ একদিন এসে বললেন, 'চল, ম্যান্ডালে যাওয়া যাক। আমাকে রেঙ্গুনে বদলি করেছে।' শুনে আমি তো নেচেকুঁদে অস্থির। ঠাকুমার কিন্তু মুখ একেবারে তোলো হাড়ির মতো হয়ে উঠল খবরটা বলতেই। কিচ্ছু বললেন না। ঠাকুরদা শুধু গম্ভীর গলায় 'এই রকম খারাপ সময়ে ওসব দেশে যাওয়া কি ভালো?' বলে চুপ করে গেলেন। ঠাকুমা এবার কথা না-বলে পারলেন না, 'নিজে যাচ্ছো যাও, ছেলেমেয়েদের রেখে যেতে হবে।'

বাবা অনেক বোঝালেন। যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছুই হবে না দু-চার বছরের মধ্যে। তাছাড়া আদত চাকরি তো কলকাতাতেই—এটা শুধু এক বছরের একটা বদলি বই তো নয়! ঠাকুমা তবু গজগজ করতে লাগলেন।

কয়েকদিন ধরে অনর্গল 'পরামর্শ' চলার পর ঠিক হল যে দাদা থাকবে, ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা এক বছর পরে—তাই ইস্কুল, জায়গা বদলানো অসম্ভব, ইত্যাদি। আমার ব্যাপারে দিদি জামাইবাবুর চিঠির উপর নির্ভর করে ঠিক হল আমি ম্যান্ডালেতেই থাকব—যতদিন বাবা রেঙ্গুনে থাকেন। বাড়িতেই মাস্টারের কাছে পড়ব। বাবা থাকবেন রেঙ্গুনের কোনো হোটেলে। মাঝে-মাঝে ম্যান্ডালে আসবেন, মাঝে-মাঝে কলকাতা। ঘোরার চাকরি যখন, তখন এসব অনিয়মের ঘোরাতেও তেমন কোনো অসুবিধে হবে না।

জাহাজে না-চড়া পর্যন্ত আমার কিন্তু বিশ্বাস ছিল না। ঠাকুমা তো ক্রমেই যেন আবার বেঁকে বসছিলেন। দাদাটার কোনো আশা নেই জেনেও ও মাঝে-মাঝে বায়না ধরছিল, 'আমিও যাব, বাবা।' পাছে ওর জন্যে আমিও বাদ পড়ি, তাই সান্ত্বনা দিয়ে 'আসছে বছর যাস্ ভাই,' বলে ওর হাত ধরলাম সেদিন। রেগে-মেগে উঠে দাদা চলে যেতে-যেতে আমার গালে

একটা চিমটি কেটে বলল, 'আদুরে ছিঁচকাদুনে বোকা কোথাকার!'

জাহাজ জেটি ছাড়ল। দূরে দাদার ছোট্ট শাদা রুমালটা তখনো দেখতে পাচ্ছি। কলকাতা দূরে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। ভারি তো শহর কলকাতা! চোখের চারপাশটা চিনচিন করে উঠল। দুৎ! যাচ্ছি রেঙ্গুনে। কি মজা! কিন্তু তবু কলকাতা কেন দূরে সরে যাচ্ছে!

— তিন —

প্রায় ছমাসের ওপর বর্মায় এসেছি। জামাইবাবু তো এরই মধ্যে দু-দুবার শিকারে ঘুরে এলেন, আমাদের বাদ দিয়েই। এবার যে তালেগোলে রাজী হয়ে যাবেন ভাবাই যায়নি।

ভেবে দেখলাম মজাই যখন করতে যাচ্ছি তখন বাবা বেচারিই বা বাদ পড়েন কেন? চুপি-চুপি বাবাকে লিখলাম—

'শ্রীচরণেষু বাবা, জামাইবাবুরা শিকারে যাবে। জ্যাক্, জিল, আমি আর দিদিও এবার যাচ্ছি। জঙ্গলটা গভীর নয় এই যা দুঃখু। জিল্এর বাচ্চাদের নিতে কেউ রাজী হল না। সেইজন্যে আমার একটু মন খারাপ। কিন্তু ওরা নেহাতই বাচ্চা। হয়তো বাঘ কিম্বা হাতি দেখলে কেঁদেই মরবে। কিন্তু তুমি ঠিক এস, বাবা। কাউকে না-জানিয়ে। আগামী সপ্তাহে বুধবার যাওয়া ঠিক। খুব মজা হবে। আপিসের সাহেবকে বললেই হবে তোমার দু-মেয়েরই অবস্থা ভালো নয়। কেননা সত্যি-সত্যি আমার তো ভীষণ মনকেমন করছে, দিদিরও। এস, এস ঠিক। প্রণাম জেনো। ইতি—
তোমার মিনি।'

বাবা ঠিক আগের দিন এসে হাজির। 'শিকারের গন্ধে-গন্ধে এলাম।'

বলে যেই বাবা গেটে হাত লাগিয়েছেন অমনি 'ঘেউ, ঘেউ, ভেউ, ভেউ, কুঁই মুঁই, ক্যাঁও ম্যাঁও' করে একবাড়ি কুকুর, বেড়াল, পাখি, বাঁদর তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে দিল। আমি তখন গেটের ধারে মস্ত চেরিগাছের উঁচু একটা ডালে দুহাতে ঝুলছি। আমার সামনের ডালে ছোট্ট দুটো পা ঝুলিয়ে বসে মা-খিন-মিয়া বলছে, 'ইস্! অত উঁচু থেকে আর লাফাতে হয় না।' মা-খিনের বয়েস আমার চাইতে অনেক কম। ওরা জাতে জেরাবাদি। মানে ওর বাবা ছিলেন বাঙালী মুসলমান আর মা বর্মী। পাশের বস্তিতে ওঁরা থাকতেন।

বাবার সাড়া পেয়ে আমি ইশারায় মা-খিন-মিয়াকে চুপ করতে বললাম। বাবা হাঁকলেন, 'ও প্রতুল, তোমার এসব চিড়িয়াখানার সদস্যদের একটু না-হটালে ঢুকি কি করে। মেয়েরা সব গেল কোথায়?'

বাবার ডাক শুনে দিদি আর জামাইবাবু একই সঙ্গে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। প্রণাম করা হলে দিদির থুতনি ধরে যেই বাবা জিগগেস করেছেন, 'কেমন আছিস?' অমনি দিদিটা এমন ছিঁচকাদুনে, চোখ মুছতে শুরু করে দিল।

আমি আর বেশি দেরি না-করে, একটা মাঝামাঝি ডালে ঝুলে পড়ে দিলাম এক লাফ। তাগ বুঝে। সঙ্গে-সঙ্গে মুখে সিনেমার টারজনের মতো আঁ-আঁ করে চিৎকার করতে-করতে ঝুপ করে গিয়ে পড়লাম বাবার ঠিক সামনে। সবাই চমকে পিছিয়ে গিয়েছিল। আমাকে দেখে দিদি তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, 'দেখেছ বাবা, কি অসভ্য মেয়ে হয়েছে। সব সময় গাছে-গাছে। কিম্বা কুকুরের আড্ডায়। ওর জামাইবাবুই তো ওর মাথা খাচ্ছে।'

জামাইবাবু তখুনি বলে উঠলেন, 'আমি, না তোমার—' উনি বলতে

যাচ্ছিলেন 'বাবা' কিন্তু হঠাৎ বাবাকে সশরীরে সামনে দেখে একটু থতমতো খেয়ে থেমে গেলেন। বাবা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠতেই মা-খিন-মিয়া গাছের ওপর থেকে হি-হি করে বেজায় হাসতে শুরু করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা তিনজনও চেঁচিয়ে হাসতে আরম্ভ করলাম।

বাড়ির চোদ্দটা কুকুরই এল বাবার সমাদর করতে। চেনা-চেনা মানুষটা অথচ রোজ থাকে না। জ্যাক্-এর মুখ দেখে মনে হয় ও বলছে, 'কোথায় ছিলে এতদিন?' জিল্ চকচক করে বাবার হাত চেটে দিতেই বাবা ঠাট্টা করে বললেন, 'প্রথমে ভাবতাম তুমিই একটা পাগল প্রতুল। এখন দেখছি আমিও কম পাগল নয়। আজকাল আমারও বেশ লাগে তোমার এসব পুষ্যিদের।' আমি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম, 'বাবা আমার দলে। দিদির দলে নয়।' বলে ফ্রকের বেল্টে আটকানো গুল্তিটা উঁচিয়ে বাবাকে বললাম, 'এ দিয়ে আমি সুপুরিগাছ থেকে সুপুরি পাড়ি জানো?'

'কেন, পাখি মারিসনে?'

'ছ্যাঃ, পাখি মারব কেন? ওরা কি সুন্দর দেখতে।'

বাবা বললেন, 'বেশ, বেশ।' তারপর চেরিগাছটা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ গাছের ডালে ছোট্ট একটা হনুমান বসে আছে মনে হচ্ছে।'

কথাটা শুনেই মা-খিন-মিয়া হট্টগোল শুরু করে দিল, 'ও মিনিদিদি, আমায় নামিয়ে দাও।'

বাবা হেসে বললেন, 'ও তাই বল, মিনির বন্ধু! আমি বলি হনুমান!'

বাবাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে দিদি গেল জলখাবার গুছোতে আর বাবার স্নানের ব্যবস্থা করতে। জামাইবাবুও চাকরদের হাঁকডাক করে ওঁর

চিড়িয়াখানার বাসিন্দাদের খাওয়ানোর জন্যে তাড়া দিতে উঠে গেলেন। এ সময়টা বেশির ভাগ খাঁচাই খোলা থাকে। চারটে থেকে পাঁচটা হল এদের খাবার সময়। খাওয়ার পর রাত্তিরের মতো প্রায় সবাই আটক পড়ে যে যার ঘরে।

বাবাকে বললাম, 'যাবে বাবা ওদের খাওয়ানো দেখতে? দিদি ততক্ষণ তোমার খাবার তৈরি করুক।'

বাবা 'বেশ তো' বলে জুতোজোড়া পায়ে আবার গলিয়ে নেবার জন্যে পা-দুটো বাড়িয়ে দেখেন জুতো নেই। দেখা গেল জিল্-এর বাচ্চা দুটো মহানন্দে চোখ আধবোজা করে বাবার নতুন জুতোর শুকতলা তারিয়ে-তারিয়ে খাচ্ছে। মা-খিন-মিয়া আর আমি বেশ খানিকটা মল্লযুদ্ধের পর তবে জুতোজোড়া উদ্ধার করতে পারলাম।

বাবা মাথা চাপড়ে হায়-হায় করে উঠলেন, 'আহা একেবারে নতুন জুতোজোড়া!'

আমাদের কুকুরগুলোর মধ্যে গোটা চারেক নেড়ি ছাড়া ছিল একটা বুলটেরিয়ার, দুটো ফক্স টেরিয়ার, চারটে এ্যালসেশিয়ান, দুটো ককার-স্প্যানিয়াল আর একটা গোল্ডেন রিট্রিভার।

এতগুলো কুকুরের মধ্যে বাবার সবচাইতে পছন্দ ছিল গোল্ডেন রিট্রিভার—ডায়ানাকে। দেখলেই বাবা 'আহা-হা' করে তাকিয়ে থাকতেন। ডায়ানা ছিল যেমন সুন্দর তেমনি শান্ত। লালচে-সোনালী বড়-বড় লোমগুলো আলোয় ঝকমকিয়ে উঠত। করুণ চোখ মেলে চেয়ে গা ঘেঁষে বসত। তারপর ডান হাতটা কোলে তুলে দিয়ে 'শেক হ্যান্ড' করার অনুরোধ জানাত। ডায়ানার আবার অন্য কুকুরদের সঙ্গে মোটেই বনিবনা ছিল না। বন্ধুর মধ্যে ওর ছিল নেড়ি বাঘা আর রুশি বেড়াল। বাঘা

নামেই নেড়ি। সাহসের দিক থেকে জ্যাক্-এর চাইতে এক চুলও সে কম ছিল না।

বাঘাকেও বাবা খুব ভালোবাসতেন। ওকে দেখলে নাকি বাবার ছোট-বেলার পোষা কুকুর টুনির কথা মনে হয়। বাবা শিস দিয়ে ডাকতেই খাওয়া-টাওয়া ছেড়ে বাঘা দিল এক লাফ। লেজ-টেজ নেড়ে এমন হুলুস্থুলে বাধাল যে বাবা একেবারে অস্থির হয়ে পড়লেন। জিগগেস করলেন, 'ডায়ানা কই বাঘা?'

বাঘাই ছিল একমাত্র কুকুর যাকে সব জাতের কুকুরই মানত। এমনকি পুষুর মতো দুষ্টু হুলো বেড়ালটাও বাঘাকে মেনে চলত। বাবা ডায়ানাকে খুঁজছেন বুঝতে পেরে বাঘা কুঁই-কুঁই করে প্রথম ডাকতে লাগল। ডায়ানা তার খাবার থালা ফেলে রেখে কোথায় যেন গিয়েছে। খোঁজাখুঁজি করতে-করতে দেখা গেল রুশি বাইরের ঘরের মোড়ায় ঘুমুচ্ছিল। খাবার ঘণ্টা তার কানেই যায়নি। সেইজন্যে ডায়ানা তার খাবার ফেলে রুশিকে তুলে দিতে গিয়েছে।

বাবা বললেন, 'দেখেছিস্ ডায়ানাটা কি রকম ভালো। যেমন চেহারা সুন্দর তেমন স্বভাব।'

ইতিমধ্যে দেখি রুশিটা ডায়ানাকে থাবা দিয়ে মেরে সরিয়ে দিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছে। আর ডায়ানা কিচ্ছুটি না-বলে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুধু দেখছে।

পিয়া আর লিয়া বলে টিয়া দুটোর খাবার সময় যত কথা ফোটে। শুনলাম চিৎকার করে বলছে, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।' বাবাকে দেখেই দাঁড়ের ওপর ওদের কি নাচ, 'এসেছে রে এসেছে।'

বাবা তো হেসে অস্থির। বললেন, 'খুব ওস্তাদ টিয়া তোমার প্রতুল।'
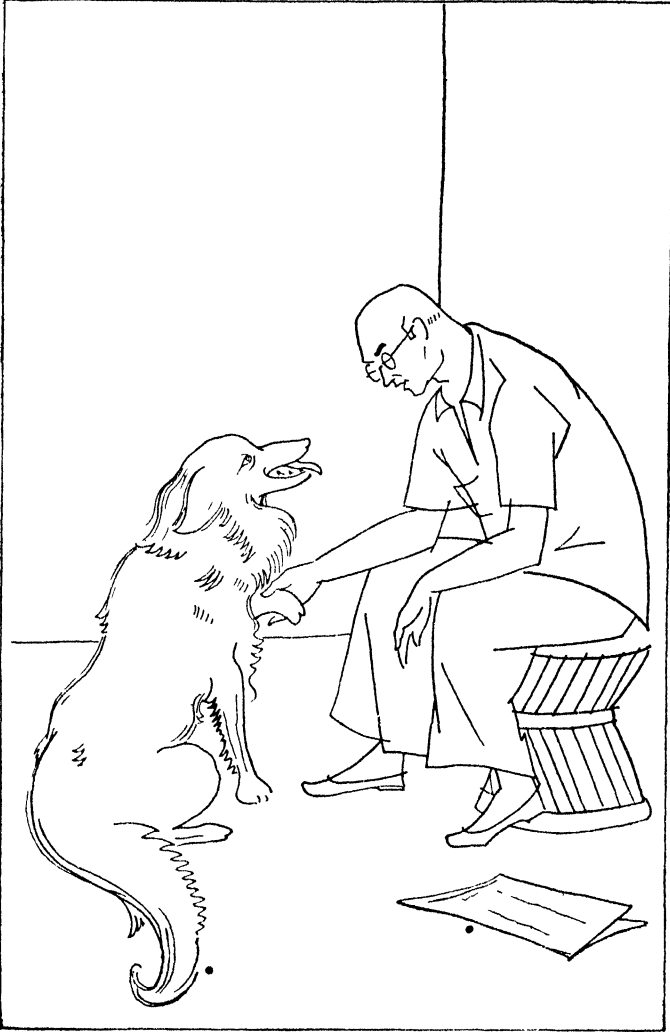
বলতে-বলতে চেয়ে দেখি রূপী বাঁদরটা ওর খাঁচায় বসে কিচকিচ করে কি যেন সব বলছে। হাত নেড়ে-নেড়ে সে বাবাকে ডাকল দু-চারবার। বাবা কাছে যেতেই একহাতে জাপটে বাবার মাথাটা ধরে শুরু করে দিল উকুন বাছতে। যদিও বাবার মাথায় উকুন একেবারেই ছিল না তবু রূপী তার কল্পনার উকুন বেছে-বেছে কামড়ে খেতে লাগল।

বাবা তো 'গেছি! গেছি!' করে লাফালাফি জুড়ে দিলেন। আমি বললাম, 'একটু বেছে দিক না বাবা। মনে কর পাকা চুল বাচছে।' আমি কিন্তু মনে-মনে হাসছিলাম। প্রথম-প্রথম রূপীর হাতে না-জেনে দু-একবার পড়ে গিয়েছিলাম। এখন আর রূপী আমাদের না-ধরতে পেরে সুযোগমতো কুকুর বা বেড়ালগুলোকে ধরে এঁটুলি বেছে দেয়।

জামাইবাবুর এখানে ভারি একটা মজার জিনিস দেখি। কুকুর আর বেড়ালের মধ্যে কোনোই বাঁধাধরা ঝগড়া নেই। ওদের যেমন ঝগড়া তেমনি ভাব। এমনকি জ্যাক্ পর্যন্ত বেড়ালগুলোকে কিছু বলে না। বেড়ালগুলো দিদির বিছানাতেও গিয়ে শোয়। কিন্তু দিদি কিছুই বলে না ওদের। বললে বলে, 'বেড়াল তো আর কুকুর নয়।'

বাবা ডায়নাকে একটু গলা চুলকে আদর করে শুতে চলে গেলেন। খাওয়া সারতে-সারতেই বাবার হাই উঠছিল। বললেন, 'ট্রেনে এক ছিটে ঘুম হয়নি। তারপর কাল আবার ভোর রাত্তিরে রওনা হতে হবে।—এই মিনি, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়্ শিগগির।'

শিকারের কথা ভাবতে-ভাবতে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। ঘুমের ঘোরে খালি মনে হতে লাগল রূপী যেন আমার উকুন বাচছে। মাথাটা যতোই সরাই ও ততোই আমায় জাপটে ধরে। শেষে হঠাৎ ধপাস করে একটা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম আমি খাট থেকে মাটিতে পড়ে

গিয়েছি। উঠে দেখি রূপীর জায়গায় রুশি আমার বালিশে নাক গুঁজে ঘুমুচ্ছে আর মাঝে-মাঝে হাত-পা ছুঁড়ছে।

— চার —

পরদিন রাত থাকতে কে আমায় এক ধাক্কা দিতেই আমি কাঁই-মাঁই করে ওপাশ ফিরে শুলাম। কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার কে কাতাকুতু দিতেই 'দুত্তোরি ভালো লাগে না!' বলে যেই বালিশটার নিচে মাথাটা চালিয়ে দিয়েছি, শুনলাম জামাইবাবুর গলা, 'থাক্ না বীণা। ওকে ডেকে কাজ নেই। বুড়ি ঊর্মিলার জিম্মায় ও বেশ থাকবে।'

কথাটা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তৈরি হয়ে নেবার জন্যে এক দৌড় দিলাম। জামাইবাবু আর দিদি হাসতে লাগলেন।

আমার কিন্তু তখন এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। কোনোরকমে তৈরি হয়ে নিয়েই একবার ছুটতে হবে জিল্-এর বাচ্চা রিনি আর কিনির সঙ্গে দেখা করতে। ওদের মা-বাবা একে চলে যাচ্ছে তায় আমরা থাকব না। চিনেবাদাম খাওয়ার জন্যে দিদি যে পয়সা দিয়েছিল তার থেকে চারআনা ঊর্মিলাকে দিয়ে দিলাম রিনি-কিনিকে মিষ্টি বিস্কুট কিনে দেবার জন্যে। তারপর চটপট মা-খিনের সঙ্গে দেখা করে এসে জামাইবাবুর সামনে মিলিটারি কায়দায় সেল্যুট করে বললাম, 'রেডি।'

আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে। জামাইবাবু চাকরদের শেষবারের মতো সব উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে দিচ্ছেন। ঊর্মিলা ঝি অনবরত বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'তা মেয়েছেলেদের আবার শিকার-মিকারে নে যাওয়া

কেন বাপু!' আসলে এত বড়ো বাড়িতে একা-একা থাকার ভয়ে ও একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

দিদি ওকে ভরসা দেবার জন্যে বলল, 'ওপরের ঘরের সামনে বাঘাকে রেখো ঊর্মিলাদি। ও একাই একশো। তাছাড়া নিচে তো অন্য লোকজনরা থাকলই।'

সমস্ত বাড়ি তচনচ লণ্ডভণ্ড করে গোছগাছ-করা জিনিসগুলো গাড়িতে উঠল। জামাইবাবু ঊর্মিলাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া শেষ হতে-না-হতেই আবার নোংরা করার জন্যে এসে পড়ব আমরা।'

শুনে ঊর্মিলা আঁচলে চোখ মুছে যেই 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে উঠেছে, সঙ্গে-সঙ্গে পিয়া তার দাঁড়ে এক পায় দাঁড়িয়ে গলায় কচকচ শব্দ করে দু-চোখ বুজে বলে উঠল, 'বল রাধে গোবিন্দ—পাখি, বল রাধে গোবিন্দ।' পিয়াকে হরিনাম করতে শুনে লিয়া তারস্বরে গাল-গলা ফুলিয়ে চেঁচানি জুড়ল 'হরি হে দীনবন্ধু—'

হরিনাম শুনতে-শুনতে আমরা দুখানা গাড়িতে গাদাগাদি হয়ে উঠে পড়লাম। বাবা বললেন, 'তাড়াতাড়ি রওনা হও প্রতুল, নয়তো তোমার টিয়ারা এবার কেত্তন ধরলে গাড়ির চাকা আটকে যাবে।'

জেফরসন-এর গাড়িতে বাবা আর জেফরসন ছাড়া উঠল সাহেবের আরদালি আবদুল আর জামাইবাবুর বর্মী চাকর উ-বা-স। জামাইবাবুর গাড়িতে জামাইবাবুর পাশে, সামনেটায় মজা করে বসল দিদি। আর আমি জ্যাক্ আর জিল্‌কে নিয়ে মনের আনন্দে ভেতরে রইলাম।

জিনিসপত্র যেন গাড়ির পেট ফেটে বেরিয়ে পড়ছে। এতদিনের বানানো লিস্টটা বাড়তে-বাড়তে কি বড় যে হয়ে উঠেছে!

জামাইবাবুর সব তাতেই যে একটু বাড়াবাড়ি আছে তা বুঝতে নিশ্চয়ই এতক্ষণে কারু কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু তবু শুনলে অবাক হবে যে দিদির জন্যে পর্যন্ত একটা বন্দুক আনা হয়েছে। জামাইবাবু কিন্তু ভালো করেই জানেন যে বাঘ দেখলে দিদি তক্ষুনি বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তবু এ হেন দিদির জন্যেও বন্দুক আনা চাই।

আর আমার বেলায় কি আনা হয়েছে জানো? যদিও জামাইবাবু ভালো করেই জানেন যে আমি সত্যিকারের টারজানের মতো এ-ডাল থেকে ও-ডাল, এ-গাছ থেকে ও-গাছ ঝোলাঝুলি লাফালাফি করে বেড়াতে পারি, যদিও জানেন যে আমি সাইকেলে হিল্লি-দিল্লি ঘুরে আসতে পারি, এমনকি বীর হনুমানের সঙ্গে একবার কুস্তি করে এক কাঁদি কলা পর্যন্ত বাঁচিয়েছি, তবু আমার জন্যে নেওয়া হয়েছে একটা এয়ারগান্। আর তা দিয়ে নাকি পাখি ছাড়া আর কিছুই মারা চলে না।

কথাটা জানতে পেরে আমার ভারি অপমান লেগেছিল। কেননা দুনিয়া সুদ্ধু সবাই জানে আমি পাখির মতো নিরীহ জীব কখনোই মারি না। মারি যদি তো বাঘ। নিদেনপক্ষে ভাল্লুক। তার চাইতে কম হিংস্র জন্তুদের মারতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এয়ারগান দিয়ে কোনো হিংস্র জন্তুই মারা যাবে না।

ঠিক করলাম দিদির পাশে-পাশে থাকব। বাঘ দেখে ও যখন অজ্ঞান হয়ে পড়বে ওর বন্দুক দিয়েই দু-একটা মেরে ফেলব। তখন জামাইবাবু আর জেফরসন বুঝবেন। বাবাও। বাবা তো দেখছি এসেই ওদের দলে বেশ ভিড়ে গিয়েছেন। আমি একেবারে আশাই করিনি। তাছাড়া বাড়িতে যতই দিদি আর জামাইবাবুর খিটিমিটি ঝগড়া হোক, এখন গাড়িতে দেখছি বেশ ভাব। আচ্ছা দেখা যাবে সবাইকে!

মিমনে পোঁছতে বেশ বেলা হয়ে গেল। একটা মস্ত ঝিলের ধারে গাড়ি থামিয়ে খেয়ে নিলাম আমরা। খাওয়ার পরও কিন্তু পেটটা বেশ খাঁই-খাই করতে লাগল।

শুনলাম এখনকার মতো এখানেই আস্তানা গাড়া হবে। রাত্তিরে কাছাকাছি ডাক-বাঙলোয় ঘুমোনো আর সারাটা দিন কেবল টো-টো— বাঘ, ভাল্লুক, পাখি, খরগোশ—যার যত ইচ্ছে ধরো আর মারো।

কি-কি শিকার করা যায় ভাবতে-ভাবতে এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে জ্যাক্ আর জিল্‌কে নিয়ে কখন যে বনের পথে বেশ খানিকটা ঢুকে পড়েছি খেয়ালই করিনি। হঠাৎ কি একটা 'খ্যাক্' করে উঠতেই আমি টেনে ছুট লাগালাম। এয়ারগানটা পর্যন্ত ফেলে এসেছি গাড়িতে!

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম একটা খ্যাঁকশেয়ালি সড়াৎ করে উল্টোদিকে ছুটে পালাচ্ছে। শব্দ পেয়ে জ্যাক্ আর জিল্ ভীষণ চিৎকার জুড়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে চেনে প্রচণ্ড টান দিয়ে বনের দিকে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে আমাকেও প্রায় টেনে নিয়ে গেল।

আবদুল আর উ-বা-স গেল আশপাশের হালচাল জানতে। এ ব্যাপারে ওরা ছিল পাকা ওস্তাদ। তাছাড়া ডাক-বাঙলোয় খবর দেওয়া থাকলেও এসব শিকারের মরশুমে অনেক সময় হঠাৎ কেউ এসে দখল করে নিলে অবাক হবার কিছু নেই।

বাবা আর দিদি দেখলাম বেজায় ব্যস্ত। দিদি দিতে আর বাবা খেতে।

বাবা জানতেন না যে জ্যাক্ আর জিল্ কখনো ফেলে দেওয়া জিনিস খায় না। তাই বাবা যখন এক টুকরো পাঁউরুটি জ্যাক্-এর দিকে ছুঁড়ে দিলেন, সে রীতিমতো নাক সিঁটকে উঠে গিয়ে জামাইবাবুর কাছে বসল। খুবই খিদে পেয়েছিল ওদের। কিন্তু এমনই ট্রেনিং দেওয়া

ছিল যে অসময়ে বে-জায়গায় খাওয়াটা ওরা খুব অন্যায় মনে করত।

বাবা ঠোঁট উলটিয়ে বললেন, 'বাবাঃ, এ যে একেবারে নবাবপুত্তুর দেখছি।'

আমি জামাইবাবুকে বললাম, 'জ্যাক্‌দের খাবার বের করে দিতে বল না।'

কিন্তু জামাইবাবু একটা ম্যাপ নিয়ে তখন জেফরসন-এর সঙ্গে আলোচনায় এমনই তন্ময় যে কোনো কিছুতেই কান দেবার সময় নেই। কাজেই আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে দিদি বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দিচ্ছি ওদের খাবার বের করে।'

খানিক পরে আবদুলরা ফিরে এল সঙ্গে এক বাঙালী ভদ্রলোককে নিয়ে। টাক মাথা, গোলগাল চেহারা কিন্তু হাতে একটা বেখাপ্পা বন্দুক। গালে পানদোক্তা গোঁজা, মুখে ফিক-ফিক হাসি।

জানা গেল ডাক-বাঙলোর একখানা ঘর উনি দখল করেছেন। আবদুলদের কাছে আমাদের খবর শুনে উৎসাহের চোটে নিজেই ছুটে এসেছেন।

গতকাল নাকি ওঁর দলের শিকারীরা মস্ত এক ভাল্লুক মেরে নিয়ে চলে গিয়েছে। তার সঙ্গের ছোট্ট বাচ্চাটা ধরা পড়েনি। বনের মধ্যে কোথায় সেঁধিয়ে আছে। তবে বেশি দূরে আর কোথায় যাবে অতটুকু বাচ্চা! খুব জোর মাস পাঁচেক বয়েস। ধরতে পারলে দামে বিক্রি করা যাবে। ভদ্রলোকের ভারি শখ ভাল্লুকটাকে ধরেন। টাকার জন্যে নয়। কেননা তা নাকি ওঁর ঢের আছে। আসলে একটা ভাল্লুক ধরতে পারলে নাতি-নাতনীরা গর্ব করে বলবে, 'হ্যাঁ, ছিল বটে আমাদের দাদু—বাঘা শিকারী!' কিন্তু মুশকিল হল দলের অন্যদের নিয়ে। তারা বড় ভাল্লুকটাকে পেয়ে মনের

আনন্দে আজ সকালে শহরে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু যতীনবাবু যেতে পারেননি। সারাদিন ধরে প্ল্যান ভাঁজছেন আর মনে হচ্ছে---একা-একা শিকার করা যায়! ঘ্যান-ঘ্যান করে তিনি আরো অনেক কথাই বললেন।

বাবা অপেক্ষা করছিলেন ভদ্রলোকের একটা দম নেবার জন্যে। যেই বিন্দুমাত্র থেমেছেন অমনি বাবা খাবার প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খান দাদা। আমার মেয়ের নিজের হাতের তৈরি।'

তক্ষুনি ওঁর কথা দম-ফুরানো গ্রামোফোনের মতো থেমে গেল। কি বলছিলেন তার খেই হারিয়ে ফেলে হেঁ-হেঁ করে খেতে শুরু করে দিলেন। বেশ খানিকটা খাবার পর একটা স্যান্ডউইচ-এ কামড় দিয়ে জিগগেস করলেন, 'বাঃ চমৎকার! কি দিয়ে বানিয়েছ মা?'

দিদি উত্তর দিল, 'মুরগি।'

কথাটা উচ্চারণ করামাত্র যতীনবাবু থু-থু করে স্যান্ডউইচটা ফেলে দিলেন। জেফরসন ফ্যাল-ফ্যাল করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে নিজের স্যান্ডউইচটা একবার দেখলেন। তারপর জামাইবাবুর দিকে অবাক হয়ে একটু চেয়ে আবার ম্যাপে মন দিলেন।

যতীনবাবু বেশ সপ্রতিভভাবে বললেন, 'বল কি? মুরগি? আমি দীক্ষা নিয়েছি। বন্য কুক্কুট ছাড়া অন্য মুরগি খাই না। ইস্! বড়ো অন্যায় হয়ে গেল। অবশ্য না-জেনে খেয়েছি—ঈশ্বর মাপ করে দেবেন।' বলে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি ঈশ্বরের কাছে মাপ চাইলেন।

ওঁর হাবভাব কথাবার্তা শুনে আমরা সবাই যেন থ বনে গিয়েছিলাম। বাবা এবার মুখে হাত ঢাকা দিয়ে একটু হাসলেন। হাসি সামলে আবদুলকে ডেকে বললেন, 'আজ সারাদিন তুমি বন্য কুক্কুট মারবে, বুঝলে?'

আবদুল তো অবাক। 'বন্য কুক্কুট কি সায়েব?' বলে সে সবারই মুখের দিকে চাইতে লাগল।

বাবা ওকে অন্যদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, 'বন্য কুক্কুট মানে বুনো মুরগি। হিন্দুদের ব্যাপার জানো তো? পোষা মুরগি খাবে না—জাত যাবে। তাই বনের মুরগি চাই। তুমি এক কাজ কর। বুনো মুরগি পাও তো ভালো। নয়তো দুমদাম বন্দুক চালাও এলোপাথাড়ি। তারপর পোষা মুরগি কিনে গুলি করে মেরে বন্য কুক্কুট বলে বুঝিয়ে দিও আমাদের। কিন্তু মুরগি আজ চাই-ই চাই।'

আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। বললাম, 'তুমিও কি দীক্ষা নিলে ওরকম করবে, বাবা?'

'পাগল নাকি! মুরগি খাওয়া বন্ধ করা আমার দ্বারা হবে না।' বলে বাবা হাসলেন। তারপর গলা উঁচিয়ে দিদিকে বললেন, 'বীণু, আমি আজ মাংস রাঁধব রাত্তিরে। বন্য কুক্কুটের মাংস।'

আবদুল একটুও না-হেসে যেমন বন্দুক পরিষ্কার করছিল তেমনি করতে লাগল। ও কখনো হাসে না।

বাবা রাঁধবেন শুনে দিদি খুব উৎসাহ পেল বলে মনে হল না। খুঁতখুঁত করে শুধু বলল, 'কেন তুমি কষ্ট করে রাঁধবে বাবা? আমিই করে দেবোখন।'

বাবা একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'সে কি কথা! আমার হাতের মাংস রান্না যে একবার খেয়েছে সে কখনো ভুলতে পারেনি। হস্টেলে তো আমার মাংস রান্নার রীতিমতো নামডাক ছিল।'

বাবার রান্নার নামডাকের অনেক গল্প আমরা শুনেছি। কিন্তু কক্ষনো কোনো প্রমাণ পাইনি।

আমরা যখন বাজে কথা নিয়ে ব্যস্ত তখন জেফরসন আর জামাইবাবু বনের ম্যাপটার ওপর লাল-নীল পেনসিলে লাইন টেনে-টেনে আমাদের শিকারের প্ল্যান বানিয়ে ফেলেছেন। সব প্ল্যানটাই কিন্তু সেই ছোট্ট ভাল্লুকটাকে ধরবার মতো করে করা। দেখে আমাদের সকলেরই দারুণ উৎসাহ লাগল। কেননা এত কথা মধ্যে ভাল্লুকটার কথা বারবার সকলেরই মনে হচ্ছিল।

আমি এক লাফে এয়ারগানটা বগলদাবা করে বললাম, 'এখনই চল।'

'আজ আমি জেফরসন, জ্যাক্ আর জিল্‌কে নিয়ে একটু পথঘাট চিনে আসি। আবদুলদের সঙ্গে নিচ্ছি। কাল সবাই যাবে।'

চলে যাবার সময় জামাইবাবু বাবাকে বলে গেলেন, 'আজ আর বন্য কুক্কুট হবে না। কাল শিকারের সঙ্গে-সঙ্গে মারা যাবে। এত বেলায় কোনো কিছুই সময়মতো পাওয়া যাবে না।' বলে বাবার দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন। বোঝা গেল এত বেলায় পোষা মুরগি পাওয়া মুশকিল, তাই এই ব্যবস্থা।

খেয়ে-দেয়ে ডাক-বাঙলোয় শুয়ে বাইরে অন্ধকারের জোনাকি গুনছি। মশারি ফেলা; তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বাইরেটা। নারকেল গাছটার গা বেয়ে কালো মতো কি উঠছে ওটা তরতর করে! ভাল্লুকই তো মনে হয়। তবে যে যতীনবাবু বললেন বড়ো ভাল্লুকটা মারা পড়েছে!

কে যেন বলল বড়ো ভাল্লুকটা ভূত হয়ে ওর বাচ্চাটাকে নিতে এসেছে। বলার সঙ্গে-সঙ্গে যেন স্পষ্ট দেখলাম ভাল্লুকটা জানলার গরাদ পেরিয়ে অনায়াসে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আর খালি খুঁজে-খুঁজে হয়রান হতে লাগল। অন্ধকার এত ঘন যে ভাল্লুকটাকে দেখতেই পাচ্ছি না। আমাকেও নিশ্চয় ও দেখতে পাচ্ছে না। বাঁচা গিয়েছে।

কিন্তু একি! ছোট-ছোট দপদপে আলো জেবলে আমায় খংজছে যে ভাল্লুকটা। কিন্তু আমি তো ওর বাচ্চাকে নিইনি। নিয়েছেন যতীনবাবুরা। আর যতীনবাবু তো পাশের ঘরেই আছেন। সেখানে গেলেই হয়।

ভাল্লুকটা কিন্তু গেল না, দপ-দপ করে অনেকগুলো আলো জ্বালাল। ক্রমে আমার যেন দম আটকে আসছে। এবার মনে হল ভাল্লুকটা আমার বুকে চেপে বসেছে।

চিৎকার করে উঠতেই শুনলাম দিদি, বাবা সব হৈ-চৈ করে জেগে পড়েছেন। দিদি পাশেই শুয়েছিল। ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তুলে জিগগেস করল, 'কিরে, কি হয়েছে?' আমি গোঁ-গোঁ করতে লাগলাম। কিছুতেই চোখ চাইলাম না। দিদি বাবাকে বলল, 'ও কিছু নয়, বাবা। অতিরিক্ত খেয়ে পেটগরম হয়েছে। বুক চাপা ধরেছে আর কি! তুমি শুয়ে পড়।'

'কিরে, ভয় পেয়েছিস?' আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিদি জিগগেস করল।

বললাম, 'মোটেই না।'

দিদি হাসল, 'তবে যে ওরকম রামছাগলের মতো চেঁচালি?'

'বুকের ওপর বুড়ো ভাল্লুক চেপে বসলে তুমি কি করতে জানা আছে।'

'দুৎ বোকা, কোথায় ভাল্লুক! কি একটা স্বপ্ন দেখেছিস তার ঠিক নেই!' বলে দিদি এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। তারপর মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে-পড়তে ভয় জড়ানো গলায় বলল, 'বাজে না-বকে ঘুমো।' স্পষ্ট বুঝলাম ভয়ে দিদির আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়েছে।

সব চুপচাপ হয়ে যেতেই আবার দেখলাম জোনাকির লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে অন্ধকার আবার ভাল্লুক বনে যাচ্ছে।

শুয়ে-শুয়ে এরকম ভয় পেতে কি বিশ্রী লাগে বল!

দিদিকে ডাকলাম. 'এই দিদি, আবার আসছে।'

দিদি মুথাটা আরো ভালো করে মুড়ি দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোর জামাইবাবুকে বল্।'

আমি দেখলাম ডাকাডাকি করলে শেষে কাল আমরা বাদ পড়ব। তাই খুব কষে মুড়ি দিয়ে শুলাম। একটু ফাঁক করে একটু পরে দেখি জোনাকিগুলোর লণ্ঠনের আলোয় ভাল্লুকটা তখনো আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোনো ক্ষতি করছে না।

— পাঁচ —

হাতে-হাতে বন্দুক। আবদুল আর উ-বা-স চলেছে সামনে-সামনে। ওদের হাতে জ্যাক্ আর জিল্-এর চেন্ ধরা।

ঝিলের গা বেয়ে আমরা সার বেঁধে এগোচ্ছি। জ্যাক্ আর জিল্ হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উ-বা-স আর আবদুলকে। দিদির হাব-ভাব দেখে আমি অবাক। উঁচু করে খোঁপা বেঁধে বন্দুক বাগিয়ে চলেছে। জামাইবাবুর মুখ-খিঁচোনো ভাবটা একটু কম। মুখটা বেশ হাসি-হাসি, গদগদ। দিদিকে দেখে কে বলবে কাল সারারাত অন্ধকারকে ভাল্লুক ভেবে-ভেবেই ও ঘুমোতে পারেনি!

আমাকে দেখেই কি আর বোঝার উপায় আছে কাল রাত্তিরে শুধু-শুধু ভয়ে মুড়ি দিয়ে শোবার কথা? এখন বাবার পাশটিতে বড়ো-বড়ো পা ফেলে হাঁটছি। কাঁধে এয়ারগান। আমাদের পেছনেই যতীনবাবু আর জেফরসন। কারুর মুখেই কথা নেই।

ঝিলের জল রোদে ঝিকঝিক করছে। সাড়া পেয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে পালাচ্ছে। কিন্তু কারুর তাদের দিকে চোখ নেই। সবাই শুধু ভাবছে সেই ভাল্লুকটার কথা—যাকে ধরতে হবে, যে ছোট্ট অথচ শয়তানের শিরোমণি। অথচ যে ভারি সুন্দর।

হঠাৎ সাঁই করে সামনে দিয়ে কি যেন একটা চলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বনের মধ্যে 'গকর-গকর' ডাক। শুনে দিদি 'মাগো' বলে জামাইবাবুর হাত চেপে ধরতেই জামাইবাবু আমার দিকে চেয়ে ঠাট্টার সঙ্গে একটু ঝাল মিশিয়ে বলে উঠলেন, 'বলিনি তোকে, পথে নারী বিবর্জিতা!'

দিদি অমনি সামলে নিয়ে, 'আমি মোটেই ভয় পাইনি। আচমকা বলে ফেলেছি একটা কথা, তা ও-নিয়ে অত কথার কি দরকার?' বলে অভি-মানের ভান করল।

আমি কোনো ব্যাপারেই এখন আর কথা বলছিনে। শেষে বাদ দিয়ে দেয় যদি দল থেকে?

বন ক্রমেই ঘন হচ্ছে। পায়-পায় ঝোপঝাড়। প্রজাপতি আর ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো নাছোড়বান্দার মতো সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে। দেখে শুনে আমার মনে এমন ফুর্তি এল যে শিস দিয়ে ফেললাম। শিকারের এলাকায় এসে পড়েছি বলে শিস দেওয়ায় বাবা রাগ করলেন।

'দুম্! দুম্! দুম্!' আবদুলের গুলির আওয়াজ।

বাবা বললেন, 'বন্য কুক্কুট।' আমরা একটু হাসলাম। একটা আওয়াজে সকলের যেন হাত খুলে গেল।

জামাইবাবু দুমাদুম পাখি মারতে শুরু করে দিলেন। জ্যাক্ আর জিল্ এবার ছাড়া পেয়ে শিকার-করা পাখির খোঁজে ঝোপঝাড় লণ্ডভণ্ড করতে-করতে এগিয়ে চলল।

একটা গাছের তলা থেকে জ্যাক্ জামাইবাবুর মারা একটা পাখি মুখে করে নিয়ে আমাদের পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে আবার ছুটল বনের মধ্যে। জিল্-এর গলার আওয়াজের সঙ্গে জ্যাক্ এবার গলা মিলিয়ে সাংঘাতিক হৈ-হুল্লোড় জুড়েছে।

দেখলাম পায়ের কাছে একটা নরম বুলবুলি পাখি একেবারে ন্যাতা হয়ে পড়ে আছে। ঠোঁট বেয়ে রক্ত পড়ছে। চোখ দুটো স্থির।

তাকিয়ে দেখতে-দেখতে আমার এমন কষ্ট হতে লাগল! টলটল করে জল এল দু-চোখ ছাপিয়ে। কাঁদতে আরম্ভ করব-করব দেখে বাবা বললেন, 'ছিঃ, শিকার করতে এসে কাঁদে?'

আমি অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে বলে উঠলাম, 'তা বলে বুড়ো-ধাড়ি, সে বুলবুলি মারবে কেন?'

জামাইবাবু ভীষণভাবে মুখ ভ্যাংচাতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা দূরের ঝোপের মধ্যে থেকে দারুণ গোলমাল কানে এল। জেফরসন গোড়া থেকেই প্ল্যান মতো ঝোপেঝাড়ে খুঁজছিলেন। জ্যাক্ আর জিল-এর উত্তেজিত ডাকের সঙ্গে জেফরসন-এর গলা শুনতে পেলাম, 'চৌধুরী, এদিকে এস শিগগির — ভাল্লুক!'

ব্যস্! সঙ্গে-সঙ্গে আমরা হুড়মুড় করে ছুটলাম। আমার চোখের জল গাল বেয়ে পড়ে গেল খানিকটা। কান্নাও চমকে থেমে গেল।

তারপর যে কি হল ভালো বুঝতেই পারলাম না। ঝোপের চারধারে সবাই মিলে হট্টোগোল করছে। জিল্ দুপাটি দাঁত বার করে গজরাতে-গজরাতে ঝোপের চারধারে পাক খাচ্ছে আর দাপাদাপি করছে। আবদুল উ-বা-স জেফরসন-এর দেওয়া শক্ত জালটা ঝোপের একধারে আটকে, 'ওদিক থেকে তাড়া দিন আপনারা — ঐ, ঐ তো বসে আছে ছানাটা!

জ্যাক্-জিল্‌কে লাগিয়ে দিন না!' বলে চেঁচাতে লাগল গলা ফাটিয়ে।

দিদি, বাবা আর আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে কেবল দেখছি। ওরা কতরকম কায়দা করে যে বাচ্চা ভাল্লুকটাকে একেবারে জালের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ফেলল তা দেখবার মতো জিনিস বটে।

দেড়-হাত লম্বা একটা কালো লোমের পুঁটলি বই তো নয়। কিন্তু কি তার তেজ! গোঁ-গোঁ ঘর্‌র্-ঘর্‌র্ শব্দ করতে-করতে ছানাটা ছোট-ছোট ছুঁচলো দাঁত বার করে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। আর অতটুকু জীবটাকে চারজনে টেনে ঠাণ্ডা করতে পারছে না।

'এবার এটা তোমার জন্যে' বলে জেফরসন আমার তখনো ভেজা-ভেজা চোখের দিকে চেয়ে হাসলেন। জাল জড়ানো অবস্থাতেই বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম বাচ্চাটাকে। কুচকুচে লোমের মাঝখানে করমচার মতো টকটকে লাল চোখ। বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। বুকে শাদা ধবধবে ইংরিজি 'ভি' কাটা। কি চমৎকার মানিয়েছে!

আনন্দে আমি আটখানা। চোখের জল ভালো করে মুছে ফেলে জিগগেস করলাম, 'একে মেরে ফেলবে না তো?'

জেফরসন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না, না, ওটাকে তুমি পুষো।'

আমি হাত বাড়িয়ে ছানাকে ডাকলাম, 'ববি!'

ও কোনো সাড়াশব্দ করল না। দাঁত দিয়ে জাল কাটতে লাগল এক মনে। আবদুল উ-বা-সর হাত থেকে দড়িটা নিয়ে ফাঁস পরাতে-পরাতে বলল, 'উকে রশি দিয়ে বাঁনতে হোবে।'

ওরা বাঁধবার তোড়জোড় করছে দেখে আমি সাহস পেয়ে ববিকে একটু ছুঁলাম মাত্র। সঙ্গে-সঙ্গে ও থাবার নখ বার করে আমায় খিম্‌চে দিতেই আমি 'বাপ্‌রে!' বলে লাফিয়ে উঠে বাবার কাছে সরে এলাম।
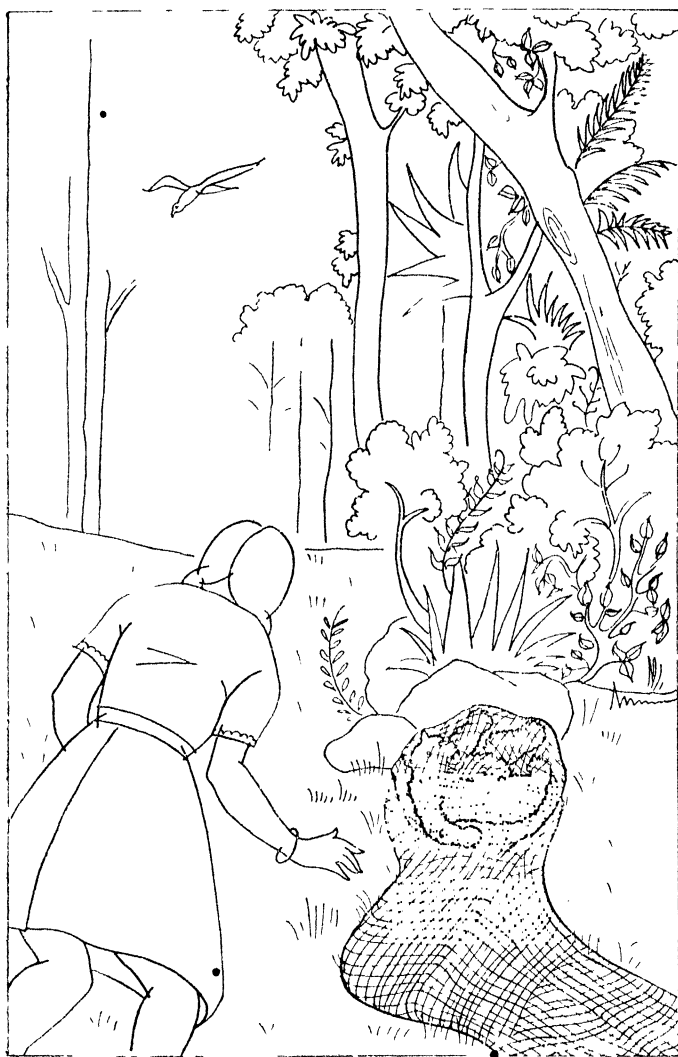
বাবা, দিদি আর জামাইবাবু বকাবকি জুড়ে দিলেন খুব। অন্য সময় অতটা রক্ত পড়তে দেখলে আমি অনেক বেশি চেঁচামেচি করতাম। কিন্তু ভয়ে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করতে হল আমাকে।

সঙ্গে ছোট্ট 'ফার্স্ট এইড'-এর বাক্স ছিল উ-বা-সর কোমরে আটকানো। আয়োডিন তুলোয় মাখিয়ে দিদি লাগিয়ে দেবার পরও আমি চেঁচালাম না দেখে বাবা অবাক হয়ে গিয়ে তাকালেন। রাগ করে এবার বলে উঠলেন, 'ভাল্লুকের সঙ্গে চালাকি নয় মিনি। ওরা বাঘের মতো হিংস্র। বুনো ভাল্লুক এক চড়ে মানুষের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে। বাচ্চা হলেও ওরা খুব হিংস্র হয়।'

যতীনবাবু তাল দিয়ে বললেন, 'আহা, বড্ডো লেগেছে মিনির!'

'ভারি তো একটুখানি আঁচড়ে দিয়েছে,' যতটা সম্ভব তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠলাম আমি।

জামাইবাবু মুখ ভেঙ্চে বললেন, 'সেপ্টিক হলে বুঝবে তখন! বীণা, ওর হাতটা ভালো করে বেঁধে দাও।'

জেফরসন কিন্তু আমার পক্ষ নিলেন। উনি সব সময় আমার পক্ষে। দিদি বলে ওঁর নিজের ছেলেপিলে নেই কিনা তাই আমাকে অত আদর দেন।

যাই হোক ভাল্লুক পাওয়ার আনন্দে আমরা সবাই বেশ মেতে উঠেছি। উ-বা-স জামাইবাবুর সামনে হাত পেতে বসল, 'সায়েব, আমার বক্‌শিশ।'

বাবা, যতীনবাবু, জেফরসন, জামাইবাবু উ-বা-স আর আবদুলকে হাতে-হাতে বক্‌শিশ দিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে জেফরসন ইংরিজিতে একটা ভাল্লুক সম্বন্ধে গান শুরু করলেন হেঁড়ে গলায়।

আমরা বাড়ি ফিরেও ভাল্লুকের গল্পই শুনতে লাগলাম। কে কবে

কত হিংস্র ভাল্লুক দেখেছেন বা তার গল্প শুনেছেন, সেই সব কথা।

যতীনবাবু সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'উঃ! আর বাদামী ভাল্লুক যে কি সাংঘাতিক হিংস্র! মানুষের টুঁটি টিপে গরম রক্ত খায়। রক্ত খাওয়া হয়ে গেলে মাংস খায়। তার পর হাড়গোড় চামড়া— ছিটেফোঁটা ফেলে না। স্বচক্ষে একবার ওদের একটা প্রকাণ্ড কি পাখি ধরে খেতে দেখেছি।'

দিদি জিগগেস করল, 'কোথায় ?'

উনি থতমত খেয়ে বলে ফেললেন, 'চিড়িয়াখানায়।'

শুনে সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

এমন সময় আবদুল আর উ-বা-স ফিরে এল। আবদুল গোমড়া মুখে একরাশ বন্য কুক্কুটের বোঝা নামিয়ে রেখে চলে গেল ভেতরে। উ-বা-স হাসি-হাসি মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাযেব, মুরগি এনেছি।'

'বন্য কুক্কুট বল।' বাবা ধমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কথাটা মনে থাকে না,' বলে কুতকুতে চোখ জোড়া কুঁচকে হাসতে লাগল উ-বা-স।

বাবা রাঁধবার সময় দিদিকে একেবারে উনুনের ধারে-কাছে আসতে দিলেন না। মুখ অন্ধকার করে ঠোঁট উল্টিয়ে ক্যাম্প খাটে শুয়ে পড়ে দিদি বলল, 'বেশ তো, আমার ছুটি।'

সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছি। বাবা তো খাওয়ার আগে থেকেই, 'কেমন হয়েছে, কেমন হয়েছে' করে অস্থির করে তুললেন।

একটুকরো মাংস মুখে দিয়েই দিদির মুখটা কি রকম হয়ে গেল। আমি চেখে দেখলাম নুনে আব হলুদে পোড়া মাংসটা। একেবারেই হতকুচ্ছিত।

তবু দিদি বলল, 'বেশ হয়েছে তো।'

সবাই মুখে দিচ্ছে আর 'হুঁ-হাঁ' করে সায় দিচ্ছে। বাবা একগাল খেয়ে বললেন, 'বাঃ চমৎকার হয়েছে।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'ইস্! বন্য কুক্কুটের গায়ে বড্ডো হলুদ আর নুন!'

শুনে বাবা তো খেপে কাঁই। চটেমটে বললেন, 'হলুদ হল রান্নার প্রথম আর প্রধান — আর বলতে গেলে একমাত্র মশলা যা ডাক্তাররাও খেতে বলেন। হলুদ না-হলে গরমের দেশে মরতে-মরতেই জীবজন্তুর মাংসে পচ ধরে যেত। হলুদ মোটেই বেশি হয়নি। ঠিক হয়েছে।'

ওদিকে জেফরসন মাংস জলে ধুয়ে নিয়ে খেতে শুরু করে দিয়েছেন। ভাবখানা, আমি তো সাহেব, হলুদটা আমায় মাপ কর।

শুধু হলুদ সত্ত্বেও যতীনবাবু মহা উৎসাহে বন্য কুক্কুট কুটকুট করে খেতে লাগলেন। পান খাওয়া কমজোরি দাঁতের মাঝখানে শাদা-শাদা হাড়-গুলো মুড়ি-মুড়কির মতো কুড়মুড়িয়ে উঠছিল। 'নাঃ, কে বললে খারাপ হয়েছে! এ অতি সুস্বাদু জিনিস,' বলতে-বলতে যতীনবাবুর যেন কণ্ঠ-রোধ হল।

ওঁর মুখের কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকল ববি। ছেঁড়া জালের খানিকটা গায়ের লোমে লেগে আছে। গলার কাছে আটকানো দড়িটা খানিকটা নেমে এসে ছেঁড়া।

চোখের পলক পড়তে না-পড়তে সে এক কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেল। আধ-খাওয়া পাতের ওপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি ধাক্কাধাক্কির ঠেলায় জামাই-বাবু না কে যেন হড়কে পড়ল। সবাই এঁটো হাতে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে তো দেখছেই। কিচ্ছু করতে পারছে না।

ব্যাপারটা এতই তাড়াতাড়ি ঘটেছিল যে জ্যাক্ আর জিল্ পর্যন্ত জানতে পারেনি। আমাদের চেঁচামেচিতে আবদুল ওদের নিয়ে এসে হাজির। তখন সত্যি-সত্যি প্রলয় বাধল। জ্যাক্ আর জিল্ চেঁচাচ্ছে। ছোট্ট একটা দানবের মতো ববি সব কিছু ছড়াচ্ছে, ভাঙছে। বাবা তো তাঁর রান্নার জন্যে হায়-হায় করতে লাগলেন।

আমি হঠাৎ কিছু না ভেবে-টেবেই মোহনবাগানের গোলকিপারের মতো ববির দিকে একটা 'ডাইভ্' দিয়ে, পেছন দিক থেকে ওকে জাপটে ধরলাম।

দিদি চিৎকার করে উঠল, 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, টুঁটি টিপে ধরবে!'

বাবা ছুটে এলেন। জামাইবাবু, জেফরসন আর যতীনবাবুও হুড়ো-হুড়ি বাধিয়ে এগিয়ে এলেন আমার দিকে, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মিনি।'

কিন্তু আমি ছাড়ব কেন? ধরেছি যখন একবার, শেষ না দেখে ছাড়ব না।

ববি আমার বাঁ-হাতের কব্জিতে দাঁত বসিয়ে 'গর্-র-র' করতে লাগল। কিন্তু তবুও আমি ছাড়লাম না। ওর গলার দড়িটা চেপে ধরে ডাকলাম, 'আবদুল, জল্দি।'

আবদুল লাফিয়ে এসে সজোরে টান দিল ববির গলার দড়িতে। তারপর চোয়ালে চাড় দিয়ে ববির মুখ থেকে আমার কব্জি ছাড়িয়ে আনল। জ্যাক্ আর জিল্ রেগে উন্মত্তের মতো ববির সামনে বিকট ডাক ডেকেই চলেছে। আমি এক ধমক লাগালাম ওদের। তারপর ববির মাথা চাপড়ে দিলাম।

এবার ববি কিন্তু কিছু বলল না। আমার কব্জি থেকে টপ্টপ্ করে রক্ত পড়ার দিকে তাকিয়ে 'গর্-র-র' করে ডেকে উঠল শুধু। তারপর

করমচার মতো চোখ জোড়া ঘুরিয়ে ঘরের সবাইকে একবার দেখে নিয়ে ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগল।

আমি আবার ওর মাথাটা একটু চাপড়ে দিলাম। ও এবারও কিছু করল না। দিদি খুব খেপে গিয়ে আমাকে এক হ্যাঁচকা টানে ববির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। হাতে আয়োডিন লাগাতে-লাগাতে ধমকে উঠল, 'উঃ, কতটা রক্ত পড়ে গেল বল্ তো? কেন, অন্য কেউ ধরতে পারত না বুঝি? বাহাদুর কেবল তুই একাই — না?'

আয়োডিনে জ্বালা করলেও আমার হাসি পাচ্ছিল। কেননা এতক্ষণে ভালো করে চেয়ে দেখার সময় পেলাম।

এঁটোকাঁটা মেখে কি মূর্তি হয়েছে সকলের! সব চাইতে মজার দেখাচ্ছে যতীনবাবুকে। এত কাণ্ডের মধ্যেও মুরগির ঠ্যাংটা ঠিক হাতে থেকে গিয়েছে।

আঙুল দেখিয়ে হি-হি করে হেসে উঠে আমি বললাম, 'বন্য কুক্কুট!' সঙ্গে-সঙ্গে সকলের ঘর-ফাটানো সে কি হাসি!

পরদিন যতীনবাবু কাঁদো-কাঁদো মুখে মেমিও রওনা হলেন। যাবার সময় অনেকবার আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে গেলেন। নাতি-নাতনীদের যেন আমরা গিয়ে বলি কী বাঘা শিকারী তাদের দাদু!

— ছয় —

ম্যাণ্ডালেতে ফিরে এসেই আমি অসুখে পড়লাম—সেপ্টিক জ্বর। ভাল্লুকের কামড়ে ঘা বিষিয়ে গিয়েছে। খুব জ্বর আর মাথাব্যথা।

জ্বরের মধ্যেই আমি ববির খবর পেতাম ঠিক। সামনের বাড়ির উ-বা-

টিন-সাহেবের ছেলে টিন-টুট আমার চাইতে বছর দুইয়ের ছোট হলেও বর্মায় ও ছিল আমার গুরু। পাড়ার সমস্ত খবর ওর কাছে পাওয়া যেত বলে বড়োরাও ওকে খাতির করত। জামাইবাবু ওর নাম রেখেছিলেন 'গেজেট'। ওর কাছেই আমি ববির সব খবর পেতাম।

আমরা ফেরার পর থেকেই ববি আছে জেফরসন-এর কাছে। এ বাড়িতে ওকে আনলে দিদি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে বলে নাকি শাসিয়েছে। দিদি বলে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া ভাল্লুকটার জন্যেই আমার এই দশা। দিদি ছাড়া বাবা, জামাইবাবু—সবাইর আপত্তি ছিল ববিকে আমাদের এখানে নিয়ে আসায়।

জ্বর ছেড়ে গিয়ে যেদিন পথ্যি করলাম আর ডাক্তারবাবু বললেন কোনো ভয় নেই, তার পরের দিন বাবা রেঙ্গুন রওনা হলেন। বাড়িটা খাঁ-খাঁ করতে লাগল।

বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। ঊর্মিলাদিকে আর বুড়ো হাড়ে আমাকে ধরে-ধরে ওঠা-নামা করাতে হয় না। নিজেই বেশ উপর-নিচ করে বেড়াই। বাগানে ঘুরি। মা-খিন আর টিন-টুট আমার সঙ্গী। ববির খবর নিই ওদের দিয়ে। আমার তো বেরুনোই বারণ।

কি করি! দুপুরে জামাইবাবু যান কোর্টে। দিদি পাশেই এক বাঙালী বাড়ি সেলাই আর আড্ডায় ভেড়ে। ঊর্মিলার পেটে 'পান্তো' পড়লেই ওর চোখ ছোট-ছোট হয়ে আসে। একটু পরে নাক ডাকে।

দিদিকে বললাম, 'বারে, আমি সারাদিন বুঝি কড়িকাঠ গুনব! ববিকে আনিয়ে দিলেই হয়।'

'কেন ববি ছাড়া বাড়িতে কি জন্তু-জানোয়ারের অভাব হয়েছে! তোদের বুঝি বনে রাখলেও জন্তু দেখার আশ মিটবে না! ধন্যি সব।
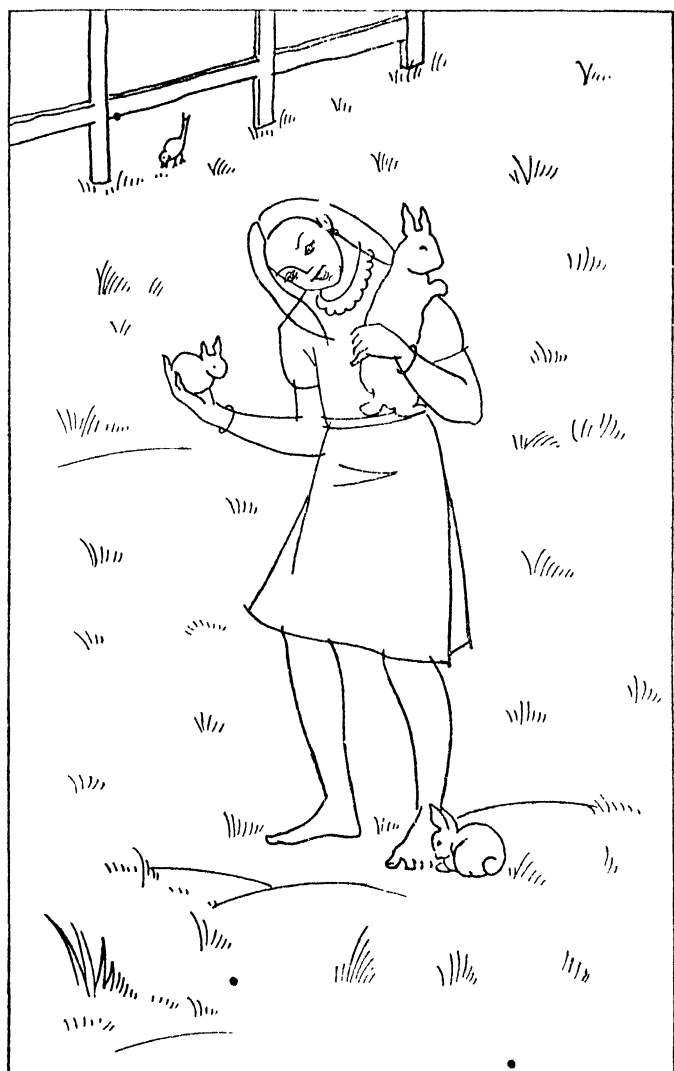
যা, যা, রূপী জ্যাক্ জিল্ ওদের সঙ্গে খেলগে। তাছাড়া টিন-টুট আর মা-খিন তো আছেই।' কথা কটা খুব ঝাঁঝ দিয়ে বলে দিদি সংসারের কাজে মন দিল। আমি গজগজ করতে-করতে গেলাম খাঁচাগুলোর দিকে।

ধুনি মুরগিটার ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা হয়েছে কদিন আগে। উ-বা-স কায়দা করে একটা হাঁসের ডিম রেখে দিয়েছিল ওর ডিমগুলোর মধ্যে। তাই ধুনির সবসুদ্ধ চারটে মুরগির আর একটা হাঁসের বাচ্চা ফুটেছে। হাঁসের ছানাটা দেখলাম দিব্যি ধুনির পেছনে-পেছনে ঘুরে-ঘুরে খুঁটে-খুঁটে কি খাচ্ছে। এখন ডানার নিচে পাঁচটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে ধুনি ঢুলতে আরম্ভ করেছে দেখছি।

বুলো আর বুলা খরগোশের কম কটি ছানা হয়নি। শাদা-শাদা খুদে ছানাগুলোর চুনির মতো লাল-লাল চোখ দেখলে কি যে আদর করতে ইচ্ছে করে! কিন্তু দিদি খরগোশ ঘাঁটতে দেয় না। বলে, অন্য যা-ইচ্ছে ঘাঁটতে পারি কিন্তু খরগোশগুলো নাকি ওর। বেড়ালগুলোতেও ওর আপত্তি নেই। আর ও কি করে, নিজের সব বন্ধুদের কাছে খরগোশের ছানাগুলো বিলিয়ে দেয় একটু বড়ো হলেই। আমার মত নেই জেনেও বিলি করে দেয়।

আমি খাঁচা খুলে আদর করতে গিয়ে দেখি বুলো আর বুলা সামনের থাবা দিয়ে খাঁচার নিচের জমি বেশ খানিকটা তুলে ফেলে সুড়ঙ্গ বানাচ্ছে। আমাকে দেখে ওরা একবার লাল-লাল চোখ মেলে চাইল। তার পর ব্যস্ত-ভাবে নিজেদের কাজে মন দিল।

আমি মনে-মনে হাসলাম। দিদি বেশ জব্দ হয়ে যাবে যদি ওরা মস্ত বড়ো সুড়ঙ্গ কেটে বনের মধ্যে গিয়ে ওঠে। আমায় শুধু জেনে নিতে হবে এ-সুড়ঙ্গ বানাতে ওদের কতদিন লাগবে।

খরগোশদের কাছে অতক্ষণ কি করছি দেখার জন্যেই বোধ হয় পিয়া চোখ পিটপিটানি বন্ধ করে বেশ সজাগ হয়ে সরে এল। বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে-নেড়ে ক্যাটক্যাটে গলায় বলতে লাগল, 'এ কি রে বাবা, এ কি রে বাবা!' শুনে লিয়া অমনি ধুয়ো তুলল, 'কি আপদ, এ কি রে বাবা! অ ঊর্মিলাদি, এ কি রে বাবা —'

পিয়া, লিয়ার মতলব জেনেও আমি ওদের ধারে-কাছে ঘেঁষলাম না দেখে ওরা দুজনে এবার কোরাসে ডাক শুরু করল — 'অ মিনি অ মিনি, অ মিনি, খাবি আয়, খাবি আয় অ মিনি — '

পুষু, মঁ্যামঁ্যা আর রুশি গরমে অতিষ্ঠ হয়ে মেঝেয় পেট রেখে ঘুমুচ্ছে। দিদি বলে, রুশির নাকি শিগগির বাচ্চা হবে। পাঁচটা হলে চারটেই বিলিয়ে দেবে বলে দিদি শাসিয়ে রেখেছে।

রিনি আর কিনির কাছে একটু যাব ভাবলাম। কিন্তু ভালো লাগল না। ডায়নার গলায় হাত বুলোতে-বুলোতে মাথায় এক ফন্দি এল — ববিকে একবার দেখে এলে কেমন হয়?

নিঝুম দুপুরে কে-ই বা আমায় দেখতে যাচ্ছে! শুধু সুধীর সারা সকাল ককারস্প্যানিয়েল মণ্টু আর ঝণ্টুর এঁটুলি বেছে-বেছে ক্লান্ত হয়ে এখন দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে ঢুলছে। ও কি আর দেখতে পাবে? আর পেলেই ভারি বয়ে গিয়েছে!

খুট করে খিড়কির গেট খুলে সোজা চলে গেলাম জেফরসন-এর ভেতর বাড়ির দিকে। টিন-টুট আর মা-খিন, কোথায় ববি আছে তা হুবহু বলে দিয়েছিল।

কুকুরের একটা কাঠের বাড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখেছে ববিকে। বাড়ির যেখানে আবর্জনা জমে তার ঠিক [illegible]তে ববির বাসা। দেখে খুব রাগ

হল আমার। আর কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছে ববি। ওর সামনে নোংরা একটা থালায় খাবার। পাশে আরো নোংরা বাটিতে জল।

ডাকলাম, 'ববি!'

ববি ঘাড় ঘুরোল। তারপর বোঁ করে ঘুরে ঘরের মধ্যে চলে গেল। প্রায় রানীদের গোঁষাঘরে যাবার মতো করে। অনেকবার ডাকলাম কিন্তু ববি সেই যে ঢুকল আর কোনো সাড়াশব্দই পেলাম না তার।

কাছে গেলাম। বেশি কাছে যেতে সাহস হল না। দেখলাম ঘরের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ববি হাঁপাচ্ছে। কিরকম একটা করুণ-করুণ মুখ-খানা। বড্ডো কষ্ট হতে লাগল আমার। নাঃ, ববির একটা হিল্লে আমায় করতেই হবে।

ডাকলাম, 'ববি, ববিন্!'

ববি এবার ঘাড় তুলল। মোটা-মোটা থাবা দুটো দরজায় রেখে তার ওপর মুখ লাগিয়ে ও আমায় খানিকটা দেখল।

'আমি তোকে নিয়ে যাব রে,' বলে দূর থেকেই কল্পনায় ওর মাথা চাপড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। যতক্ষণ চোখ যায় ববি চেয়ে-চেয়ে দেখল আমাকে।

বিকেলে খাবার টেবিলে বসে মুখ হাঁড়ি করে বললাম, 'খাব না, খিদে নেই।'

দিদি ভুরু উঁচু করে তাকিয়ে আমায় একবার ভালো করে দেখে নিয়ে জিগগেস করল, 'কেন রে?'

'খিদে নেই, বলছি তো।'

'বেশ খিদে আছে, খেয়ে নে।'

'আমার মন খারাপ।'

‘তাই বল্! কেন?’

‘বলব না,’ বলে আমি জামাইবাবুর দিকে আড়চোখে তাকালাম।

জামাইবাবু হেসে জিগগেস করলেন, ‘আসল কথাটা শুনি না।’

‘অত ভণিতা করা হচ্ছে কেন?’ বলে দিদি একটা মালপোয়া রসে ভিজিয়ে এগিয়ে দিল।

দিদি ভালো করেই জানে মালপোয়া দেখলে আমার জ্ঞান থাকে না। তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, ‘ববি রোগা হয়ে মরে যাচ্ছে। ওকে এ-বাড়িতে এনে দাও না।’

দিদি বলল, ‘আর যা চাও দেব, ববি চলবে না।’

জামাইবাবু কি ভেবে বললেন, ‘রোগা হয়ে যাচ্ছে বুঝি? জেফরসন-এর চাকরগুলো একেবারে লক্ষ্মীছাড়া ফাঁকিবাজ। ও টুরে গেছে কিনা তাই যা-ইচ্ছে তাই লাগিয়েছে। আবদুলটা থাকলে ঠিক দেখত।’

নরম সুর শুনে আমি ঘ্যানঘ্যান করে শুরু করলাম, ‘দাও না ভাই জামাইবাবু লক্ষ্মীটি, দিদি শুধু-শুধু চটা ববির ওপর। ওকে একটু ট্রেনিং দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। ও তো আর বড়ো ভাল্লুক নয় যে পোষ মানবে না।’

দুদিন কেটে গেল। মা-খিনদের সঙ্গে পরামর্শ করি কিন্তু কোনো ফল হয় না। জামাইবাবু জ্যাক্-এর বাহাদুরি নিয়েই ব্যস্ত। আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে গড়গড় করে বার্মিজ ভাষায় কথা বলবেন মা-খিনদের সঙ্গে। আর জ্যাক্-এর সঙ্গে বলবেন জার্মান ভাষা।

সেদিন গেটে মা-খিন আর টিন-টুটকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি যেই চুপি-চুপি ওপরে গিয়েছি জুতোটা পরতে, অমনি জামাইবাবুর ডাক, ‘মিনি, এই মিনি শুনে যা।’

যেতেই হল। অথচ আমরা বিবির ওখানে যাব প্ল্যান করেছি। ওকে খেতে দেব আর আদর করব। যে যাই বলুক না কেন!

গিয়ে দেখি জ্যাক্ চিৎপটাং হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে। ঠিক যেন মরে গিয়েছে। আঁতকে উঠে বললাম, 'একি, জ্যাক্-এর কি হল?'

জামাইবাবু আমার কথার উত্তর না-দিয়ে জার্মান ভাষায় হিটমিট করে কি বলতেই জ্যাক্ তড়াক করে লাফিয়ে পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে আমার হাতে একখানা হাত রেখে শেকহ্যান্ড করতে শুরু করল। আমি হি-হি করে হেসে ফেলে জিগগেস করলাম, 'জ্যাক্ কি সব কথাই বোঝে?'

জামাইবাবু ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আলবৎ!' বলেই আবার কি একটা বলতেই জ্যাক্ আমার মুখ এক নিমেষে চেটে চটচটে করে দিল। আমি কাঁইমাঁই করে উঠতেই জামাইবাবু হেসে অস্থির হয়ে বিষম খেয়ে, সামলে নিয়ে জ্যাক্‌কে আর একটা কি বলতেই সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিচের ঘর থেকে জামাইবাবুর সিগারেট আর দেশলাই আনল মুখে করে।

আমি হাততালি দিয়ে জ্যাক্‌কে উৎসাহ দিলাম। জামাইবাবু পকেট থেকে বিস্কুট বের করে খেতে দিলেন জ্যাক্‌কে। মাথা থাবড়ে জার্মান ভাষায় আদর জানালেন।

জ্যাক্-এর এসব কাণ্ড অনেকবার দেখেছি। কিন্তু তবু পুরনো হয় না। প্রত্যেকবারই ভালো লাগে। জিল্ জ্যাক্-এর মতো অত কথা শোনে না। জামাইবাবু বলেন, 'মেয়েমানুষ কিনা, তাই বিগড়ে বাঙালী বনে গিয়েছে।' জার্মান ভাষা সত্যি-সত্যি জিল্-এব যেন মনেই নেই বলে মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়।

আমরা যে এত কাণ্ড করছি দিদির কিন্তু সেদিকে মনই নেই। ইজি-

চেয়ারে শুয়ে রবি ঠাকুরের বই পড়ছে। জামাইবাবু আড়চোখে দু-একবার দেখার পর ডাকলেন, 'ও বীণা, কী! পড়ছ কী! শোনোই না একটু রিনি আর কিনিকে দিয়ে দেব, না রাখব?'

দিদি বই থেকে মুখ না-তুলেই জবাব দিল, 'দিয়ে দাও।'

জামাইবাবু আবার ডাকলেন, 'ও বীণা, জ্যাক্-এর কাণ্ড দেখে যাও না—'

দিদি চুপ। জামাইবাবু আবার ডাকল, 'অ বীণা, আহা শোনই না—'

দিদি তবু চুপ। শুধু বইটা খুলে রেখে এবার কানে আঙুল দিয়ে পড়তে লাগল।

দুষ্টুমি একটা কি খেলে গেল জামাইবাবুর চোখে। জ্যাক্‌কে ফিস্-ফিস্ করে কি বলতেই সে বেশ রাজসিক চালে দিদির কোলের ওপর থেকে বইটা টেনে এনে জামাইবাবুকে দিল।

রাগে চিড়বিড় করে উঠল দিদি, 'অসভ্য কুকুর কোথাকার! মেরে হাড় ভেঙে ফেলব '

ঝগড়াটা বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় নিচের থেকে টিন-টুট আর মা-খিনের গলায় প্রচণ্ড চিৎকার শুনলাম। দৌড়ে জানলায় মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখলাম ওরা ডাকছে আর বলছে, 'ববি আসছে, ববি আসছে - '

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের মধ্যে দিদি সিনেমার ভূতের ভয় পাওয়া নায়িকাদের মতো বিকট চিৎকার করে উঠল। ফিরে দেখি ববি দু-পায়ে দিদির সামনে দাঁড়িয়ে দু-হাত তুলে লাফাচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ও বোঁ করে চলে এল আমার কাছে। আসার সময় বোধহয় দিদিকে একটু ধাক্কা দিয়ে থাকবে। কেননা দেখলাম দিদি টাল সামলাতে না-পেরে পড়ে যেতেই জামাইবাবু ছুটে এসে ওকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।
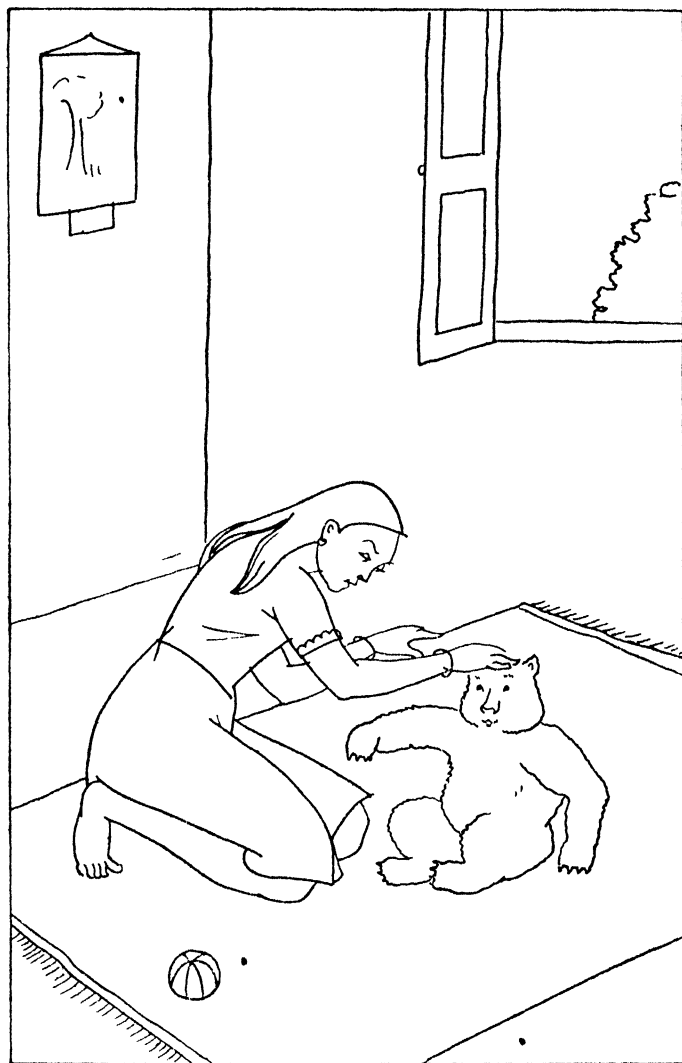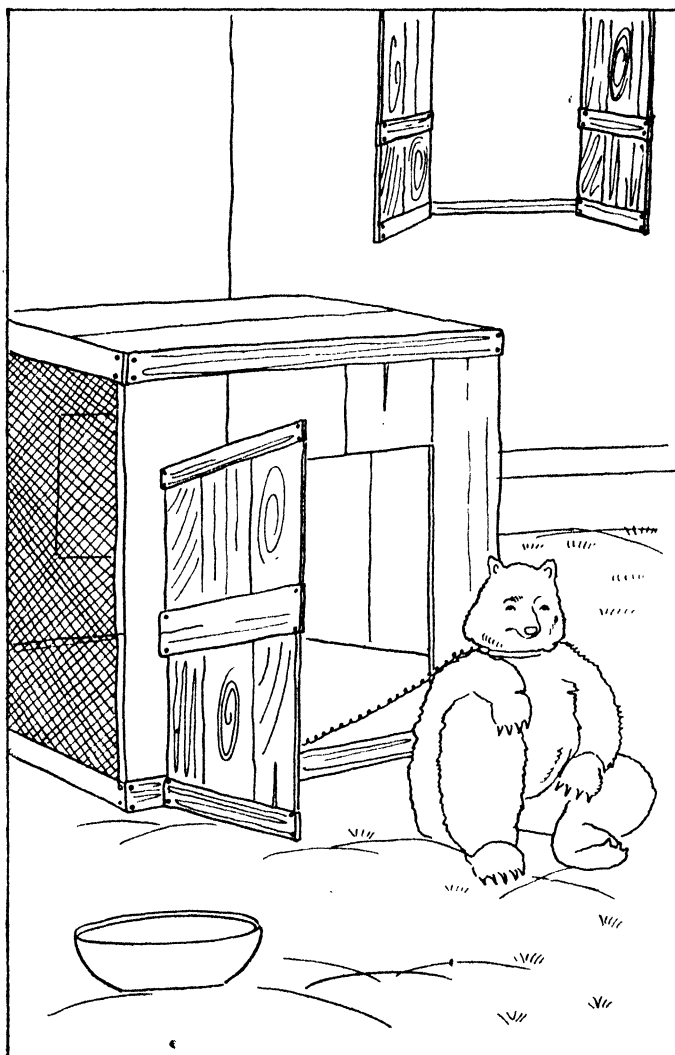
আমাকে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'মিনি সাবধান! ওর গলার ছেঁড়া চেনটা চেপে ধর্। মুখটা যেন তোর দিকে না-নিয়ে যেতে পারে।'

দিদিও কাঁদো-কাঁদো গলায় চিঁচিঁ করে বলল, 'তুমি নিজে ওকে ধর। আমি ঠিক আছি। মিনিকে যেন না-কামড়ায়।'

জামাইবাবু চেঁচাতে লাগলেন, 'ঊর্মিলা—সুধীর—উ-বা-স—শিগগির আয়। ঝণ্টুর মোটা চেনটা আন্ কেউ। এই মিনি—সাবধান!'

আমি সাবধান না-হলেই বা কি! কেননা ববি আমার পায়ের কাছে চুপ করে বসে আছে—পোষা কুকুরের মতো। জ্যাক্ ববিকে দেখেই চেঁচাতে শুরু করেছিল। এক দাব্ড়ানি দিয়ে জামাইবাবু ওকে ঘরের এক কোণে বসে থাকার হুকুম দিয়েছেন। জ্যাক্ তাই আর নড়তে পারছে না। কেবল তাকিয়ে আছে উৎসুক চোখে।

সুধীর মোটা চেনটা নিয়ে এসে হাজির হতেই আমি লক্ষ্য করলাম ববি 'গর্র্র্' করে গজরাতে শুরু করেছে। সাবধান করে দিয়ে হাঁকলাম, 'এই সুধীরদা. খবরদার এদিকে এস না। চেনটা ছুঁড়ে দাও। ববি খেপেছে।'

জামাইবাবু এগোতে যাচ্ছিলেন। ববি খিঁচিয়ে উঠতেই উনি একটু পেছিয়ে গেলেন। চেনটা সুধীর ছুঁড়ে দিল আমার হাতে।

আর আমার গর্ব দেখে কে? ঘর ভর্তি লোক। টিন-টুট, মা-খিন, ঊর্মিলা, সুধীর, উ-বা-স, জামাইবাবু, দিদি—সবাই চেঁচাচ্ছে, হাত-পা নাড়ছে কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছে না। ববি কেবল আমার কথাই শুনবে একথা সকলে এতক্ষণে বুঝেছে।

ববির কানের পাশের বড়ো-বড়ো লোমে হাত বুলিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করতে-করতে চেনটা পরাতে লাগলাম। জামাইবাবু সমানে বলে দিতে

লাগলেন কি ভাবে ছেঁড়া চেনটা খুলে ফেলে নতুন চেনটা পরাতে হবে।

আমি আস্তে-আস্তে ববিকে নিয়ে এবার নিচে নেমে গেলাম।

— সাত —

বোঝা গেল এ-যাত্রা ববি এ-বাড়িতে থেকে গেল।

'ভাঙলে-চুরলে তবু সহ্য করব—কিন্তু যদি কামড়ায় তো তোমার মনে থাকে যেন যে তখুনি ওকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে।' আমার দিকে না-তাকিয়েই দিদি কথাগুলো বলে গেল। একটু গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিতে হলেই দিদি আমায় 'তুমি' বলে।

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। দেখ ওকে কিরকম ট্রেনিং দিই আমি। জ্যাক্-এর চাইতে সভ্য করে দেব।'

শুনে জামাইবাবু একটু হাসলেন মাত্র। বললেন, 'আচ্ছা বেশ। চ্যালেঞ্জ রইল। তবে ও বর্মী-ভাল্লুক, বাঙলা শিখবে কি করে?'

আমি রসিকতাটা না-বুঝে বলে উঠলাম, 'তুমি তো বাঙালী, তবু বর্মী-ভাষা শিখলে কি করে?'

দিদি আর জামাইবাবু কথাটায় খুব খানিকটা হাসলেন। আমি আব-হাওয়া চমৎকার বুঝে ছুটলাম ববির সন্ধানে।

ববির জন্যে একটা ভালো বড়ো বাসা বানানো হয়েছিল। ছুতোর ডেকে জামাইবাবু নিজে লেগে থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বানিয়েছিলেন বাসাটা। এক দিকে তার, পেছনে জানলা, বেশ খোলামেলা বাসা।

বাসাটার দোরগোড়ায় চেন দিয়ে বাঁধা ছিল ববি। লম্বাটে মুখের শেষে নাকটা হঠাৎ থ্যাঁদা হয়ে যাওয়ায় এমন মজা লাগে দেখতে। কিন্তু

খ্যাঁদা হলেও ববি সুন্দর। বর্মীরা তো খ্যাঁদা। তা বলে কি সুন্দর নয়?

ববি কিন্তু এখনো খুব বুনো আছে। কি ভাবে যে ওর ট্রেনিং শুরু করব ভেবে-ভেবে আমার ঘুম কমে গিয়েছে। ডাকলাম, 'ববি-ই-ই!'

ববি না-উঠে শুধু লাল চোখ দুটো ঘুরোল আমার দিকে। তারপর এলিয়ে পড়ে ধুঁকতে লাগল। ',ান্ডালের এই বিকট গরমে ঐ একগাদা লোমের আড়ালে ববির নিশ্চয়ই খুব গরম লাগছে।

এখনো আচমকা কাছে যেতে ভয়-ভয় করে। কেননা ববিও চমকে লাফিয়ে ওঠে। সইয়ে-সইয়ে কাছে যেতে হয়। তাহলে ও রাগারাগি করে না বিশেষ।

ববিকে ঘুরিয়ে দেখাবার জন্যে নিয়ে চললাম অন্য খাঁচাগুলোর দিকে। ধুনি মুরগির হাঁসের ছানাটা বেশ প্যাঁক-প্যাঁকে হয়েছে। মুরগি-ছানার চারটের মধ্যে দুটোকে চিলে নিয়ে পালিয়েছে আর দুটো খেয়েছে হুলো বেড়ালে। হুলো মানে আমাদের পুষু নয় কিন্তু। আমাদের পুষুরা আমাদের বাড়ির পোষা জিনিস খায় না। পাশের বাড়ির হলে অবশ্য আপত্তি নেই। ধুনির এখন তাই সবেধন নীলমণি ঐ হাঁসের ছানাটা। ববিকে দেখে ঘাড় ফুলিয়ে ধুনি হাঁসের বাচ্চাটাকে আড়াল করে কক্-কক্ শব্দ করতে লাগল।

বাইরের ঘরের দরজার কাছে বাঘা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বসেছিল। আমাদের সাড়া পেয়েই তারস্বরে ডাকতে শুরু করে দিল। আমি ধমকে উঠলাম, 'চুপ বাঘা—একদম চুপ্—'

তবু খানিক ডেকে ওরা থামল। তারপর চোখ পিটপিট করে সদলে বাঘাদের ঢুলুনী শুরু হয়ে গেল।

এতগুলো জন্তু-জানোয়ার এক জায়গায় রাখা যে কি হাঙ্গামা! রূপীর

খাঁচার সামনে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছি অমনি সে মুখ খিঁচিয়ে ববিকে বাঁদরদের ভাষায় যা-তা গালাগালি দিতে শুরু করে দিল। ববি হাজার হোক ভাল্লুক। বাঁদরের চাইতে এক হিসেবে উঁচু জাত। তাই সেও দেখি খাঁচার গায় নাক লাগিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে দাঁত বের করে হাততালি দিতে লাগল।

এরকম উত্তেজনার মাথায় আমার হয়তো ওকে টানা উচিত হয়নি। একটু টানতেই ও ঘুরে আমার হাত কামড়ে দিল। খুব জোরে নয় তাই রক্ষে। শুধু দাঁতের দাগ বসে নীল হয়ে গেল কব্জির কাছটা। তাড়াতাড়ি দেখে নিলাম কেউ দেখতে পেয়েছে কিনা। কি ভাগ্যিস কাছাকাছি কেউ ছিল না!

একটু পরেই টিন-টুট আর মা-খিন এসে জুটল। টিন-টুট বলল, 'সুং-চিংদের পোড়ো বাগানে অঢেল চেরি ফলে আছে দেখে এলাম। যাবি?' মা-খিনটার মাত্র ছ-বছর বয়েস কিন্তু ভারি ডানপিটে। আমাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে গাছে-গাছে ঘুরবে। ও বলল, 'হ্যাঁ, মিনিদি যাবে।'

আমি পড়লাম বেজায় মুশকিলে। আজ রবিবার। জামাইবাবু সারা-দিন বাড়ি থাকবেন। তাঁর ওপর ববিকে কে সামলায়, কে ট্রেনিং দেয়! ওরা নেহাত ছেলেমানুষ। দায়িত্ব-টায়িত্ব কিছুই নেই তো, তাই সব সময় টো-টো।

মুখে বললাম, 'য্যা-য্যা! ভারি তো চেরি। কাল যাব।'

টিন-টুট মুখ নেড়ে বলল, 'ততক্ষণে সব সাফ হয়ে যাবে। ঐ বাবলু বলে ছেলেটা আছে ও পাড়ার বাঙালীদের। সে তো দেখে ফেলেছে।'

মহা মুশকিল! ভাবছি, হঠাৎ চেনে টান পড়ল। দেখলাম রিনি আর

কিনি কুঁই-মুঁই-মুঁই করে আমাদের ডাকছে। ববি ওদের দিকে যেতে চায়।

বাগানের পুব দিকটায় জ্যাক্-এর ফ্যামিলি থাকে। মস্ত বাসা ওদের। দেখলাম জ্যাক্ ওর বাচ্চাদের খেলা দিচ্ছিল একটা টেনিসের বল নিয়ে। জিল্ ভণ্ড তপস্বীর মতো চোখ বুজে যেন ধ্যান করছে। আমাদের সাড়া পেয়ে আর রিনি-কিনির কুঁই-মুঁই শুনেই জ্যাক্-এর গোটা ফ্যামিলিটাই প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করে দিল। এ কি ববিকে অভ্যর্থনা, না রাগ! অভ্যর্থনাই হবে। কেননা এ-বাড়িতে একদিনের বেশি থাকলেই সবাই বুঝে নেয় যে তাকে বাড়ির লোক ভেবে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ববিকে জ্যাক্দের সঙ্গে মোটামুটি একটা দূরত্ব রেখে আলাপ করবার সুযোগ দিয়ে মা-খিনকে বললাম, 'আজ দুপুরে দিদিরা ঘুমোলে যাব্খন। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আমার আবার কাল মাস্টারমশাই আসবেন। তাছাড়া ববির ট্রেনিং আছে।'

বুলো আর বুলা খরগোশের খাঁচাটায় উঁকি দিয়ে দেখলাম আগের গর্তটা মাটি দিয়ে বোজানো। তার একটু দূরে ওরা আবার খুঁড়তে শুরু করেছে। প্রথম গর্তটা সুধীরদা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে ওরা দেখছি ঘাবড়ায়নি। পুরো দমে নতুন সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজে লেগে গিয়েছে।

ববি আর ঘুরতে রাজী হল না। আমগাছটার তলায় শুয়ে বেজায় হাঁপাতে লাগল। দেখে বুঝলাম ওর খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। বাড়ির এদিকটায় ঘোরানো সিঁড়িটা যেখানটা দিয়ে উঠে ওপরের বাথরুমের দিকে গিয়েছে, তার ঠিক কোলে একটা জল রাখার ঘর ছিল। মালিরা বড়ো-বড়ো জালা আর টবে জল ভরে রাখত।

একটা মস্ত টবের থৈথৈ জলে রোদ্দুর ঝিকমিক করছিল। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই ববি এমন বোঁ করে পাক খেয়ে টেনে দৌড় মারল যে আমি একেবারে তাজ্জব! পলক ফেলতে না-ফেলতে ববি ঝাঁপ দিল সেই এক টব জলে। তারপর গদগদ মুখ করে জলের মধ্যে চিত-সাঁতারের ভঙ্গি করে হাসতে লাগল।

ভাল্লুকরা হাসলে যে কি চমৎকার দেখায় তা ববিকে না-দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। লোকে বলে ভাল্লুক নাকি হাসে না! তবে হাসে কে? আমি অন্তত বুঝতে পারি ভাল্লুক কখন হাসে।

প্রায় আধঘণ্টা ঝাঁপাই জোড়ার পর ববিকে অনেক কষ্টে জল থেকে টেনে তুললাম। কিন্তু ববি যেন অন্য ববি বনে গিয়েছে। শান্তশিষ্ট ভাব, চোখ ঘুরছে না গুলি ভাঁটার মতো। জিগগেস করলাম, 'হেঁড়ে মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে?'

ববি ঢুকঢুক করে মাথা নাড়ল। বিশ্বাস কর! কি অবাক কাণ্ড!

মা-খিন হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল, 'কি মজা, ববি কথা শিখেছে, বাংলা কথা শিখেছে।'

ইচ্ছে হল জামাইবাবু আর দিদিকে ডেকে দেখাই বর্মী ভাল্লুকও বাংলা শিখছে। কিন্তু নাঃ, একেবারে বাজি মাত করব পরে একদিন। এখন তো আসল কথাটা বুঝে নিয়েছি। ববিকে রোজ চান করাতে হবে আর ভালো-ভালো খাওয়াতে হবে। তাহলে ওর আর বাংলা শিখতে কতক্ষণ। সাতকোটি লোক বাংলা শিখতে পারল আর ববি পারবে না!

ববিকে বেঁধে রেখে চুপি-চুপি আমরা তিনজনে ভাঁড়ার ঘরের দিকে রওনা হলাম। ঊর্মিলাদির চোখে ধুলো দিয়ে ফল-মূল সরাতে হবে কিছু। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে দেখি ঊর্মিলাদি চা খাচ্ছে
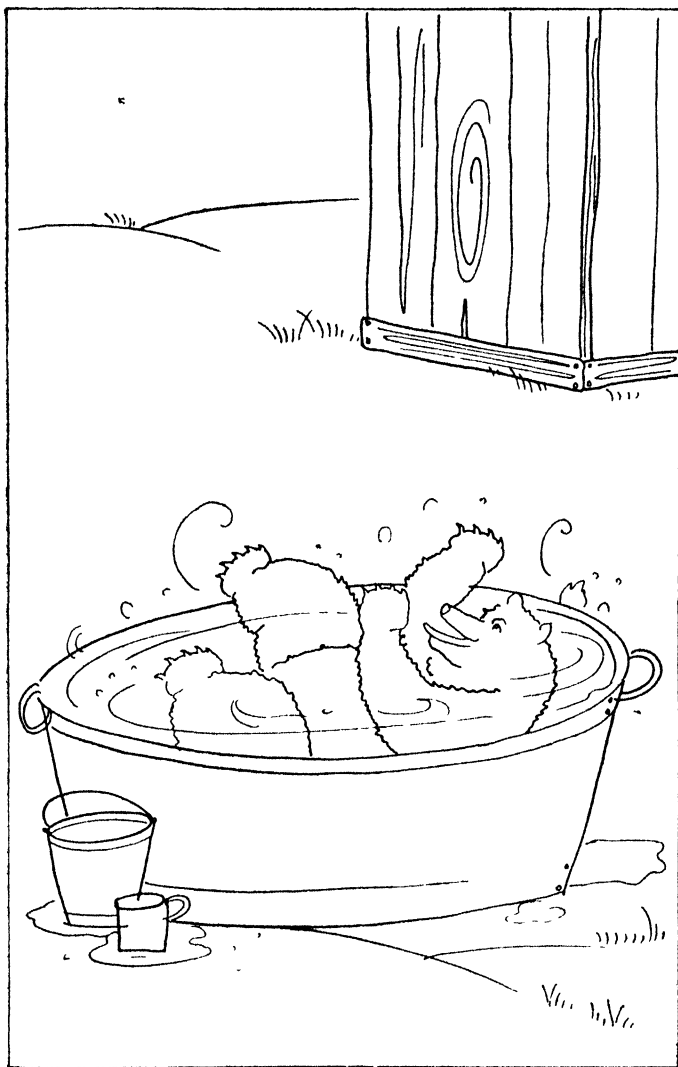
চুপি-চুপি। অমনি ওকে বেকায়দা করে দেবার জন্যে আচমকা পেছন থেকে বলে উঠলাম, 'এই অবেলায় চা খাওয়া হচ্ছে বুঝি!'

চমকে ঊর্মিলাদি চায়ের মগটা ফেলে দিয়েছিল আর একটু হলেই। ওর এক চায়ের নেশাতেই নাকি দিদিরা ফতুর হয়ে যাবে—দিদি মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলে। অন্য কিছুতে অবশ্য লোভ নেই। ভারি বিশ্বাসী।

ঊর্মিলাদি খেপে গিয়ে বলল, 'যাও না, বউমাকে বলে দাও না গিয়ে।'

সুধীর, ঠাকুর আর উ-বা-স দাঁত বার করে হাসছে দেখে ঊর্মিলাদি আরো খেপে গিয়ে বলল, 'বুড়ো বয়সে মানুষের কতরকম খাওয়ার শখ হয়। আমি কেবল একটু চা খাই বই তো নয়। বলে দাও না বউমাকে।'

আমি বুঝলাম ওষুধ ধরেছে। বাধা দিয়ে বললাম, 'আঃ কি জ্বালাতন! চায়ের কথা কে বলতে যাচ্ছে। তুমি একটু ফল আর আনাজ বের করে দাও তো ভাঁড়ার থেকে ববির জন্যে।'

গজগজ করতে-করতে বুড়ি টমাটো, শশা, মটরশুঁটি সব বের করে দিল আমাদের হাতে। বলতে লাগল, 'ইস্, কি জানোয়ারের আড়ত বাবা! ভালো-ভালো ফলমূল সব কুকুর ভাল্লুককে দেওয়া হচ্ছে। যত দোষ এ বুড়ি চা খেলে!'

ববি মহা ফুর্তিতে খেতে-খেতে হাউ-হাউ করে হাই তুলতে লাগল। একটু পরে মোটা-মোটা থাবায় নাক গুঁজে কি ঘুম যে ঘুমিয়ে পড়ল তার ঠিক নেই।

আমরা তিনজনে হাঁ করে দেখতে লাগলাম ববিকে। কখন যে ডায়ানা এসে আমাদের দলে ভিড়েছে খেয়াল করিনি। দেখলাম ও আমার কোলে

মাথা রেখে করুণ মুখে চেয়ে আছে। ওর গলা চুলকে দিয়ে জিগগেস করলাম, 'ডায়ানা, ববি ভালো ছেলে?' ডায়ানা মাথা নেড়ে সায় দিল।

— আট —

ববি যে-আন্দাজে বাড়তে লাগল, তার তুলনায় ট্রেনিং এগোল না। সভ্য হওয়া তো দূরের কথা, বেশ একটু অসভ্যই রয়ে গেল। শুধু লাভের মধ্যে রক্ত বার করে কামড়ানোটা ছেড়ে দিল। তার বদলে ধাক্কা দেওয়া, মুখ খিঁচোনোগুলো বাড়লো। ও বোধহয় বুঝে নিয়েছিল যে কামড়ালে ওর বিপদ আছে।

জামাইবাবু প্রায়ই ঠাট্টা করেন, 'কিগো ববির মা, ছেলে তো যে-বাঁদর সে-বাঁদরই রয়ে গেল দেখছি!'

আমি গুম হয়ে থাকতাম। কিচ্ছু বলতাম না। মাঝে-মাঝে ববির ওপর খুব রাগ হত।

সেদিন জানলার সামনের গাছটায় ববিকে বেঁধে রেখে মাস্টার-মশাইয়ের কাছে পড়তে বসেছি, আড়চোখে দেখলাম ববি হাততালি দিয়ে-দিয়ে নাচছে আর রূপীকে ভ্যাংচাচ্ছে। রূপী তো খেপে গিয়ে খাঁচা ভেঙে ফেলার যোগাড় করছে। কিচির-মিচির চ্যাঁ-চ্যাঁ নানারকম আওয়াজ জুড়ে দিয়েছে। ওদিক থেকে লিয়া আর পিয়াও শব্দ শুনে চিল-চিৎকার শুরু করেছে, 'বাবাঃ! কি জ্বালাতন রে বাবা—' সব মিলে অবস্থা বেশ সরগরম।

মাস্টারমশাইকে 'জল খেয়ে আসছি' বলে সোজা গেলাম ববির কাছে। ঠাস-ঠাস করে ওর গালে দুটো চড় মেরে চেনটা যেই খুলেছি
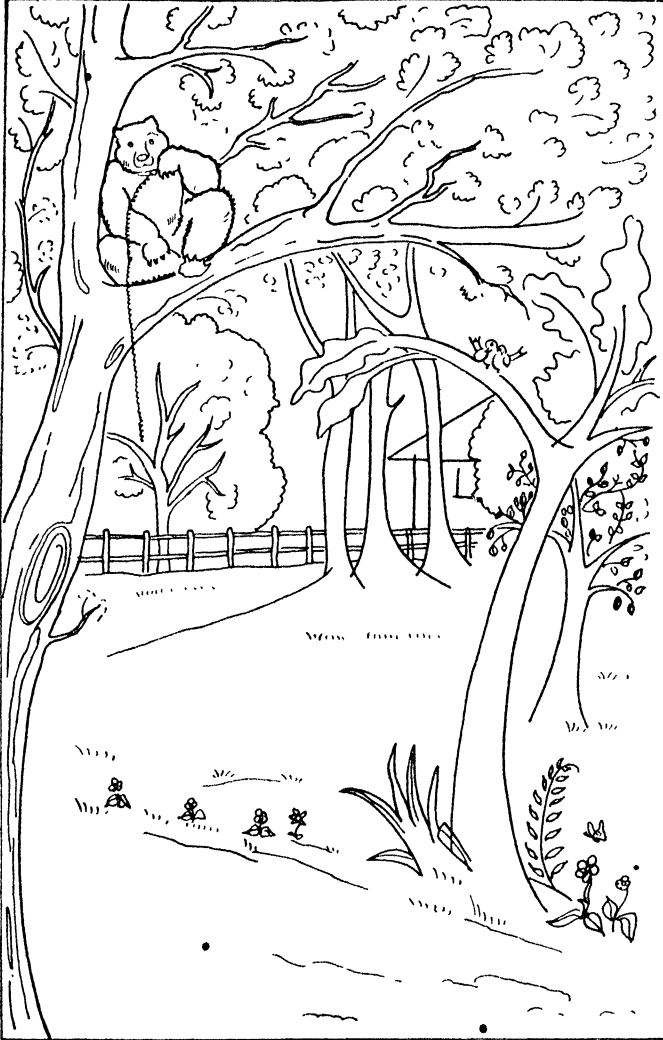
অমনি অভিমানে গরগর করতে-করতে ববি এক হ্যাঁচকা টানে চেন সুদ্ধ বাঁই-বাঁই গাছে উঠে গেল। বেশ উঁচু চেরিগাছটা। তলার দিকের ডালগুলো বাবা কাটিয়ে দিয়েছিলেন এখানে যখন ছিলেন; আমরা যাতে না-চড়তে পারি।

অনেকটা উঁচুতে তরতর করে উঠে গিয়ে ববি ডান থাবার ওপর গাল ঠেকিয়ে দার্শনিকের মতো মুখ করে কি ভাবতে বসল। ভাবছে তো ভাবছেই। কত ডাকছি তা সাড়াই নেই। যেন একেবারে হাবা বোবা হয়ে গিয়েছে। রূপী মজা পেয়ে খুব খানিক ভ্যাংচাল। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না দেখে হাত বাড়িয়ে ভোলা কুকুরটাকে ধরে এঁটুলি বাছতে লেগে গেল।

কুকুরগুলো প্রায় সব কটা একসঙ্গে ডাকাডাকি লাগাতে আমি পর্যন্ত ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু ববি নির্বিকার। খরগোশ দুটোও উত্তেজিত হয়ে দেখলাম এ ওর নাকে নাক ঘষে কান খাড়া করে, কান নাড়া দিয়ে নানা কথা বলাবলি করছে। পিয়া আর লিয়া সবাইকে টেক্কা দেবার জন্য প্রাণ-পণ চেঁচাচ্ছে। ওদের কথা কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। ম্যাঁও-ম্যাঁও করে বেড়াল কটা এসে এদের কোরাসে যোগ দিল। কিন্তু ববি যেন একেবারে গৌতম বুদ্ধটি।

মনটা আমার একদম খারাপ হয়ে গিয়ে চোখে জল এল, 'আহা, ববিকে চড়গুলো আমার মারা উচিত হয়নি।' মনে হল জ্যাক্-জিল্ থেকে আরম্ভ করে ধুনির হাঁসের ছানাটা পর্যন্ত আমায় বকছে আর ববিকে ডাকছে।

গাড়িবারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দিদি উঁচু গলায় রেগেমেগে ডাকল, 'এই মিনি! মাস্টারমশাই সেই কখন থেকে ডাকছেন কানে যাচ্ছে না বুঝি? আসুক আজ তোর জামাইবাবু। দেব ঐ লক্ষ্মীছাড়া ভাল্লুকটাকে বিদেয়

করে। সারাটা দিন কেবল ওকে নিয়ে আদিখ্যেতা।—এই ববি, তুই কি করছিস মগডালে বসে ?'

ববি ডাক শুনে এবার দিদির দিকে তাচ্ছিল্য করে তাকাল একটু। তারপর হাত বদলে বাঁহাতে গাল রেখে আকাশের দিকে চোখ ফেরাল।

ঘরে ফিরে যেতেই মাস্টারমশাই বেজায় ধমকালেন। ফলে অঙ্ক-টঙ্ক সবই ভুল হল। রাগ করে উনি প্রত্যেকটা ভুল-কষা অঙ্ক শুধরে কুড়িবার করে কষবার হুকুম দিয়ে গেলেন।

বোকা-বোকা মুখ করে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরুচ্ছি, তাকিয়ে দেখি ববি ভোল পাল্টে ফেলেছে। মাস্টারমশাইয়ের দিকে চেয়ে ও গর্‌র্‌র্ করে দাঁত খিঁচোতে শুরু করল কেন, তা আমিই শুধু বুঝলাম। আসলে ববি আমার সঙ্গে কাউকে দেখলেই তার ওপর খেপে যায়। বিশেষ করে সে যদি হয় কোনো বড়ো মানুষ।

মা-খিন বা টিন-টুট বা অন্য কোনো মহিলাকেও ও কিছু বলে না। কিন্তু পুরুষ মানুষ হলেই ওর কি যে রাগ হয়! মেয়েদের মধ্যে এক দিদি আর রূপীকেই যা ও একটু খ্যাপাতে ভালোবাসে। অন্যদের কিচ্ছু বলে না।

এ রকম একটা সঙ্কটের মুহূর্তে দিদি আবার হঠাৎ গাড়িবারান্দা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মাস্টারমশাই, চলে যাচ্ছেন নাকি ? মিনির পড়াশুনো কতদূর ?'

মাস্টারমশাইও গলা চড়িয়ে হাঁকলেন, 'কিচ্ছু করছে না। এ রেটে চললে ওর ঐ বন্ধু ভাল্লুকের মতো বুদ্ধি হয়ে যাবে বলে রাখলাম।'

মাস্টারমশাই যদি বুড়োমানুষ হতেন তাহলে কাল এলে একটা শোধ নিতাম। বুড়োমানুষদের ঠকানো অনেক সোজা। কিন্তু মাস্টারমশাই
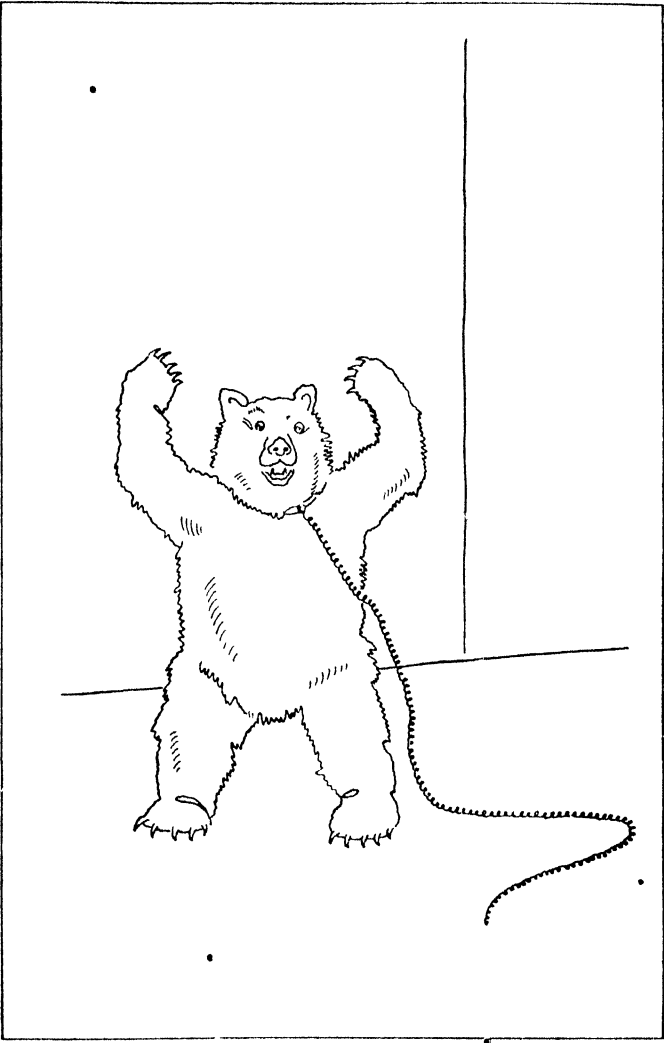
জামাইবাবুর চাইতেও ছোট। ভীষণ চালাক লোক। ওঁকে ঠকিয়ে কিছু করার আশা কম।

মাস্টারমশাই সবে গেট পেরিয়েছেন। আমি গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে আছি। দিদি তখনো ছাড়েনি আমার পেছনে লাগা। বলছে, 'মাস্টারমশাই ঠিকই বলেছেন। ববির মতো বুদ্ধি নিয়ে দেশে ফিরলেই তো ঠাকুমার একেবারে বিশ্বরূপ-দর্শন হবে আর কি!'

ববি এদিকে রাগতে-রাগতে একেবারে পাগলা হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ সে টারজনের মতো লুফে-লুফে ঝুলে গাড়িবারান্দায় এক লাফ দিয়ে সোজা চলে গেল দিদির কাছে। দিদি কোনো কিছু বোঝার আগেই দু-হাতে ববি ওকে জড়িয়ে ধরে ভিজে নাকটা গালে ঘষে, এক ধাক্কায় দিদিকে ফেলে দিয়ে সাঁ করে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

দিদি 'মাগো' বলে চোখ বুজল। আর ঠিক সেই সময় জামাইবাবু কোর্ট থেকে এসে হাজির : 'কী হয়েছে কী?'

এরপর সে আর এক কুরুক্ষেত্র পর্ব। ববি ইলেকট্রিকে দম-দেওয়া পুতুলের মতো লাফাচ্ছে, এ-টেবিল থেকে ও-টেবিল। বই ছড়াচ্ছে, এ্যাশট্রে ভাঙছে। কেউ ওকে আটকাতে পারছে না। কি হবে!

জামাইবাবু রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা। দিদি চোখ বুজে শুয়ে আছে। মাথায় হাওয়া করতে-করতে ঊর্মিলাদি বক্‌বক্‌ করেই চলেছে, 'ভদ্দর-নোকদের যত অনাচ্ছিষ্টি! গেরস্থঘরে ভাল্লুক পোষা কেন বাপু --ছিঃ!'

লাঠির বাড়ি দু-এক ঘা মার খেল ববি কিন্তু তবু কারুর হাতে ধরা দিল না। শেষে ক্লান্ত হয়ে ও আমার হাতে এসে ধরা দিল।

আমি ওর মাথা চাপড়ে ফিসফিস করে বললাম, 'সাবধান বুবুলি! ওরা বেজায় খেপেছে।'

মনে-মনে বেশ বুঝতে পারছিলাম সাবধান হলেও আর ববির নিস্তার নেই। ববিকে হারাতে হবে। এবার কেঁদেও পার পাব না বুঝলাম।

— নয় —

সত্যিই ওঁরা অসম্ভব খেপে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যে নাগাদ উ-বা-স গিয়ে উ-বা-টিনকে আর জেফরসনকে ডেকে নিয়ে এল জামাইবাবুর হুকুমে।

উ-বা-টিন একা এলেন। জেফরসন-এর সঙ্গে এল আবদুল। গোমড়া মুখ আরো তোলো হাঁড়ির মতো দেখাচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে ওঁদের কি যে পরামর্শ হল জানি না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে ওঁরা ববিকে চালান দেবার মতলব ভাঁজছেন। কিন্তু বনে বা অন্য কোথাও তা ঠিক আঁচ করতে পারছি না।

অন্ধকার সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। সিঁড়ির ফাঁকে-ফাঁকে সব কালো-কালো ভয় যেন গ্যাঁট হয়ে বসে আমায় পাহারা দিচ্ছে। তবু আমি নড়তে পারলাম না। ববির কি হয় আমায় জানতেই হবে। আর এখান থেকে ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় দাঁড়ালে কিছুই শুনতে পাব না।

কোঁ করে দরজাটা খুলতেই একরাশ আলো ঠিক যেন আমার গায় তাগ করে এসে পড়ল। দেখলাম আবদুল। আঙুল নেড়ে ইশারায় চুপ করতে বললাম। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশ খেয়ে আবদুল বলল, 'মিস্‌বাবা, ববির তো মুনিব পাল্টে যাবে।'

নিশ্বাস বন্ধ করে জিগগেস করলাম, 'কে বলল?'

'সে হামি বোলবে না' বলে আবদুল বাড়ির দিকে চলে গেল।

সারা রাত আমি স্বপ্ন দেখলাম। অন্ধকার ঘেঁটে-ঘেঁটে কারা যেন

ববিকে খুঁজছে। কালোয়-কালোয় মিশে থাকায় ববি ধরা পড়ছে না। আমিই যেন আসলে অন্ধকার বনে গিয়ে ববিকে বাঁচাচ্ছি। টর্চের আলো ফেলেও আমাদের আলো করা যাচ্ছে না।

আমি তো দিনরাত মতলব আঁটতে লাগলাম। মাস্টারমশাই বকে-বকে পড়াশুনো কিছু করাতে না-পেরে হাল ছেড়ে দিলেন। একদিন রেগে গিয়ে বলেই ফেললেন, 'প্রতুলবাবু যদি আমায় বলে দিতেন যে চাকরিটা আমার চিড়িয়াখানার, তাহলে কোন বোকা আসত এ-কাজ করতে!'

কিন্তু এসব কথা তখন আমার এক কানে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। টিন-টুট, মা-খিন আর আমি কেবল 'পরামর্শ-সভা' করছি আর মতলব ভাঁজছি। মাথার ঘিলু গিজগিজ করে কাজ করছে বটে কিন্তু কিছুই ফল হচ্ছে না।

মা-খিন শেষে 'চল্ আমরা ববিকে নিয়ে পালাই' বলে 'যবনিকা পতন' গোছের মুখ করে বসে রইল। এ প্রস্তাব মা-খিনের পক্ষে করা সোজা কেননা ওর মা গত বছর মারা যাবার পর বাড়িতে ওকে দেখার কেউ-ই নেই। ওর বাবা আলিজান দর্জি, সারাটা দিন শহরে কাজ করে। মা-খিন বেশির ভাগ সময় থাকে আমাদের বাড়িতে। ওর বাবা দিদির হাতে-পায় ধরে বলে গিয়েছে আমরা যেন ওর ওপর একটু নজর রাখি।

কিন্তু প্রস্তাবটা টিন-টুট বা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া একটু শক্ত। আমরা পালালে বন-জঙ্গল পিটিয়ে ঠিক খুঁজে বের করবে। তবু প্রস্তাবটা বেশ মনে ধরেছিল।

কয়েকটা দালাল এসে ববিকে দেখে গেল। ঠিক কশাইয়ের মতো হাবভাব। লাল-লাল চোখ বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। তেঁতুলবিচির মতো কালো-কালো দোক্তা-খাওয়া দাঁত। দেখে আমাদের গা জ্বলে গেল।

মেমিওতে যে সব সাহেব-সৈন্য এসেছে তাদের ভাল্লুকনাচ দেখিয়ে পয়সা করবার জন্যে ব্যাপারিরা ববিকে চায়। সাহেবদের তো আর এখন কাজকর্ম যুদ্ধবিগ্রহ কিছু করতে হচ্ছে না, খালি মজা কর' আর খাও। ব্যস্!

দিদির কাছে শুনলাম যে ববিকে বিক্রি করে যে পয়সা আসবে তা দিয়ে নাকি এবার পাখি কেনা হবে। আর ওসব হিংস্র জন্তু নয়। পাখিগুলোর আধাআধি বখরা হবে জামাইবাবু আর জেফরসন-এর মধ্যে।

শুনে আমার শরীর রিরি করে জ্বলে উঠল। মুখ ভেঙিয়ে বললাম, 'এত সব জন্তু-জানোয়ার পোষার তো শখ আছে। মায়া-দয়া নেই, কিচ্ছু নেই। কোনদিন তো জামাইবাবু আমাকেই বেচে দেবে দেখছি।'

মুখ কালো করে জামাইবাবুর ঘরে গিয়ে বললাম, 'ববি আমার। তুমি বেচবার কে?'

'ওমা, আমি যে ববির মেশোমশাই।' নিজের রসিকতায় জামাইবাবু নিজেই হেসে অস্থির।

ববি কিন্তু মনে হল সবই বুঝেছে। সারাটা দিন মোটামুটি চুপ করেই থাকে। মাঝে-মাঝে কেবল উঠে একটু হেঁটে বেড়ায়। তারপর মোটা-মোটা থাবাগুলোর ওপর মাথা রেখে বসে, সংসারে খুব ঘেন্না হয়ে গেলে যেমন হয়, ওর মুখটায় তেমনি তাচ্ছিল্য-তাচ্ছিল্য ভাব ফুটে থাকে।

— দশ —

জামাইবাবু দুদিনের জন্যে 'টুরে' গেলেন। কি একটা জরুরী মামলার কাজে। যাবার সময় আবদুলকে ডেকে বলে দিয়ে গেলেন যে ভালো খদ্দের

পেলেও যেন জামাইবাবুর ফেরা পর্যন্ত ববিকে বিক্রি করা না-হয়।

উ-বা-স যাচ্ছিল জামাইবাবুর সঙ্গে। কাজেই বাড়িতে পুরুষমানুষ বলতে এক সুধীর। ঠাকুর রাত্তিরে তার বাসায় চলে যায়। তাই জামাইবাবু মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন।

বেশ খানিকক্ষণ শলা-পরামর্শ চলার পর জামাইবাবু একটা সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, 'দেখ বীণা, সুধীরটা তো কুম্ভকর্ণের ছোট ভাই। ওর ভরসায় তোমাদের এই তিনটি বীর রমণীকে রেখে যাওয়া যায় না। দিন-কাল যা খারাপ পড়েছে তা আর বলার নয়। ছিঁচকে চুরি, ডাকাতি ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। সৈন্য আর যুদ্ধ দেখেই চোরদের মেজাজ খুলে গিয়েছে আর কি! তুমি এক কাজ কর। মিনির মাস্টারমশাইকে বরং দুদিন এখানে থাকতে বল। ভারি ভালো ছেলে। একা-একা মেসে থাকে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে ওদের প্রায় একটা আত্মীয়তাও আছে বলতে গেলে। ওকে বললে ও নিশ্চয় খুশি হয়েই মত দেবে।'

সেইদিনই মাস্টারমশাইকে প্রস্তাব করতেই উনি তো বেজায় খুশি। দিদিকে হেসে বললেন, 'মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।' শুনেই দিদি মাল-পোয়া ভাজতে চলে গেল। মাস্টারমশাই আমায় এবার বললেন, 'খুব ভয় পাচ্ছ বুঝি তোমরা? আমি থাকলে ভয় কি?'

শুনে আমি চোখটা কুঁচকে বললাম, 'আমাকে আর কারুর ভয় পাওয়াতে হয় না।'

সন্ধ্যে হতে না-হতেই আমাদের তো গা ছমছম করতে লাগল। তার ওপর মাস্টারমশাই গল্প বলার মওকা পেয়ে যত রাজ্যের চোর-ডাকাত-সিঁদকাটার গল্প ফেঁদে বসলেন। শুনতে-শুনতে এমন হল যে চোখ বুজলেও ভয় করতে লাগল।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদি মহা হট্টগোল বাধিয়ে দিল শোবার জায়গা নিয়ে। একতলার সদর ঘরে হল মাস্টারমশাইয়ের বিছানা। সিঁড়ির মুখে রইল সুধীর। আর ঠিক সিঁড়ির ওপরে দোতলার ঘরে দিদির, ঊর্মিলার আর আমার শোবার ঠিক হল।

বাঘাদের ছেড়ে দেওয়া হল বাগানে আর ডায়ানা, জ্যাক্ আর জিল্‌কে ওপরের বারান্দায়।

রিনি আর কিনিকে মাত্র কয়েকদিন আগে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা থাকলে আরো ভালো হত। একটা মাছি পর্যন্ত ওদের হাত এড়িয়ে যেতে পারেনি কোনোদিন।

'দিদি, ববিটাকে কোলাপ্‌সিবল গেটের পাশে রাখ। দেখ, ওকে দেখলেই চোর ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে। তাছাড়া ও তো আজকাল একদম কামড়ায় না। আর রাত্তিরে কাকেই বা কামড়াবে!' আমি এই সুযোগে ববিকে দিদির সুনজরে আনবার চেষ্টা করলাম।

চোরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে-করতে দিদি এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে ববিকে ভেতরে রাখতে রাজী হয়ে গেল।

সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকঠাক করেও ঘড়িতে দেখলাম মোটে আটটা বাজে। এত সকালে আলো নিবিয়ে ঘুমুতে যাওয়া মানে চোরের জন্যে আরো কয়েক ঘণ্টা বেশি জেগে বসে থাকা। এর চাইতে আরো খানিকক্ষণ গল্প করে সময় কাটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখন তো সবে সন্ধ্যে।

রেডিও চালিয়ে দিয়ে বাইরের দরজাটা খুলে আমরা মাস্টারমশাইকে ধরে বসলাম, 'একটা রাজা-বানী বা পরীর গল্প বলুন।' মাস্টারমশাইয়ের গল্পে রাজা থাক, রানী থাক, পরী থাক—একটা জায়গায় এসে কিন্তু ঠিক ভুতুড়ে হয়ে পড়বেই। আর এইসব জায়গাগুলো উনি এমন ঘন গলা করে

বলেন যে মনে হয় কারা সব যেন আমাদের চারপাশে জটলা পাকিয়ে এগিয়ে আসছে।

মাস্টারমশাই তখন সবে ছোটরানীকে বিষ খাইয়ে মেরে কি ভাবে মন্ত্রীর ছেলে রাজ্য হাতাবার চেষ্টা করছে—এমন জায়গায় এসেছেন, বাঘারা উত্তেজিত হয়ে ডেকে উঠল। আমরা কান খাড়া করে শুনলাম। মনে হল খসখস শব্দ।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু ঢিপঢিপ বুকের আওয়াজ ছাড়া আর কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। একটু পরে মাস্টারমশাই বললেন, 'যাঃ, ও কিছু নয়। আচ্ছা, তারপর শোনো।' মুখে বললেন বটে 'যাঃ' কিন্তু মুখটা একটু কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিল মাস্টারমশাইয়ের।

গল্প কেটে-কেটে যাচ্ছিল। যেতে-যেতে এক জায়গায় পেঁাছে বেশ জমে উঠল। রেডিওতে খবর বলা শেষ হয়ে এসেছে। আমাদেরও ভয় ভেঙে গিয়েছে। এবার ঘুমোতে যাব।

হঠাৎ দরজার দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মাস্টারমশাই!'

দরজার সামনেই খালি পায়, লুঙ্গি পরা, হাতে ছোরা নিয়ে একটা বর্মী লোক দাঁড়িয়ে। তার কপালে দগদগ করছে মস্ত কাটার দাগ। ঠিক তার পেছনেই আর একখানা মুখ। কালো কুচকুচে গোঁফওয়ালা একখানা মুখ।

দু-এক সেকেণ্ড গেল হতভম্ব অবস্থা কাটতে। ওদেরও, আমাদেরও। ওরা এবার এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল। বর্মীটা চাপা মোটা গলায় বলল, 'চাবি দাও, খবরদার চেঁচাবে না।'

দিদি মাস্টারমশাইয়ের দিকে মুখ নীল করে তাকাতেই মাস্টারমশাই ঘাড় নেড়ে ইশারায় চাবি দিয়ে দিতে বললেন। মুখে কারু রা বেরুচ্ছে না।

আমি ভাবছি ডায়ানা, জ্যাক্ আর জিল্ কেন আসছে না এখানে। ওরা তো ওপরের বারান্দায় ছাড়াই আছে।

চাবির গোছা হাতে নিয়ে চোরগুলো আমাদের সামনে-সামনে হাঁটার হুকুম দিল, 'পথ বাতলাও।'

কিন্তু পথ বাতলাবার আগেই দেখলাম ভেতর দিকের দরজায় দু-পায়ে দাঁড়িয়ে ববি তার লাল চোখ ঘোরাচ্ছে। এক মুহূর্ত! ব্যস, তারপর ববি এক লাফে গিয়ে বর্মীটার সামনে লাফিয়ে পড়েই তাকে বুকে জাপটে ধরল। লোকটা বিকট একটা চিৎকার করে উঠতে আমরাও প্রাণপণ চেঁচাতে শুরু করলাম। পেছনের লোকটা বেকায়দা বুঝে ববিকে মারল এক ছোরার ঘা। ঠিক ডান হাতটার ওপরে। সঙ্গে-সঙ্গে ববি একটা হাঁক ছেড়ে বর্মী-টাকে এক থাবার ঘায় অজ্ঞান করে দিয়ে কালো দুশমনটার ওপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে মাটির ওপর চিত করে ফেলে দিল।

বাঘা, জ্যাক্, জিল্ ততক্ষণে এসে পড়েছে। আধ-অজ্ঞান বর্মীটার ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে বাঘা। আর কালো লোকটার হাতের উঁচোনো ছোরাটা আবার ববির দিকে যাবার আগে সে-হাতটা মোক্ষম করে কামড়ে ধরে ফেলেছে জিল্। জ্যাক্ এক কামড়ে লোকটার লুঙ্গি ছিঁড়ে ফেলেছে। অন্য কুকুরগুলোর হট্টগোলে ইতিমধ্যে পাড়া সরগরম।

মাস্টারমশাই ছুটে বাগানে গিয়ে চেঁচাতে লাগলেন। গাড়িবারান্দার পাশের গাছ থেকে নেমে আরো দুটো লোক গলি দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। বোঝা গেল ঐ গাছ বেয়ে এরাও এসেছিল। তাইতে কুকুরের দল জানতে পারেনি।

উ-বা-টিন-সাহেব, জেফরসন-সাহেব, আবদুল, আলিজান সব হৈ-হৈ করে ছুটে এলেন। মাস্টারমশাই গেট খুলে দিয়ে এসে ছুটে ভেতরে
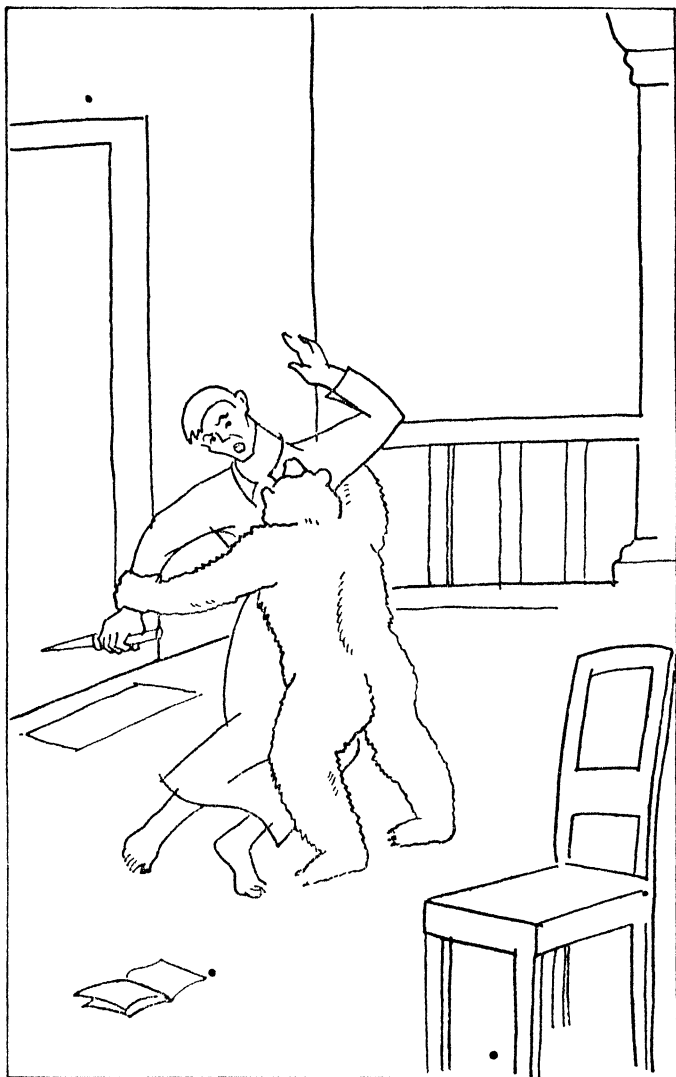
ঢুকলেন। আমি উত্তেজনায় ফ্যাকাশে মুখে বললাম, 'মাস্টারমশাই, চোরগুলোকে মেরে ফেলবে কিন্তু ওরা।'

মাস্টারমশাই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'মেরে ফেলতে বারণ কর।'

আমি আর দিদি অনেক কষ্টে কুকুরগুলোকে সামলালাম।

ববিকে টেনে আনলাম আমি। তার কালো লোম বেয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে।

জেফরসন-সাহেব এসেই আগে চোর দুটোকে বেঁধে ফেলার হুকুম দিলেন। যদিও বেঁধে না-ফেললেও ওদের পালাবার ক্ষমতা ছিল না। আর কয়েক মিনিট ওভাবে ববিদের হাতে রাখলেই ওদের পটল তুলতে হত।

উ-বা-টিন জিগগেস করলেন, 'ভেতরে কাঁদছে কে?'

ভেতরে গিয়ে দেখি ঊর্মিলাদি পা ছড়িয়ে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে, 'ও দাদাবাবু গো—অদেষ্টে আমার এ কি লেখা ছিল গো—' ওকে থামাবার চেষ্টা না-করেই ওঁরা গেলেন বাড়িটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে। ওপরে ওঠার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে আলিজান বলল, 'ও কে?'

চেয়ে দেখি সিঁড়ির পাশটায় অন্ধকারে সুধীর পাটি পেতে ঘুমুচ্ছে। আবদুল এক ধাক্কা দিল ওকে, 'আরে এ ক্যায়া! মেমসাহেবদের চোরে খুন করতে এল তা এ হারামী ঘুমাচ্ছে?'

সুধীর এবার চোখ খুলে তাকিয়ে অত লোকজন দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, 'কি? সকাল হয়ে গেল নাকি?'

শুনে এত দুঃখেও সবাই হো-হো করে না-হেসে পারলেন না।

দিদিটা আশ্চর্য শান্ত আছে বলতে হবে। ওপরে গিয়ে ফার্স্ট এইডের বাক্সটা নিয়ে এল বেশ সহজভাবে। সামনের ঘরে ফিরে গিয়ে দেখি

মাস্টারমশাই লোক দুটোকে ধমকে-ধমকে কি সব জিগগেস করছেন। আর জিল্ এক কোণে বসে মা-মা মুখ করে ববির কাটা জায়গাটা চেটে দিচ্ছে। ববি শান্ত মুখ করে চেয়ে আছে জিল্-এর দিকে। জ্যাক্ আর বাঘা ওদের মুখোমুখি বসে সাগ্রহে দেখছে জিল্-এব নার্সিং। মাঝে-মাঝে মেঝেয় পা ঠুকে তারিফও করছে।

সব চাইতে দুঃখী মনে হচ্ছে ডায়ানাকে। কারণ ও ঠিক জিল্-এর পাশটিতে বসে সেবায় একটু ভাগ বসাবার জন্যে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

দৃশ্যটা দেখে দিদি থ-হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে দেখে মাস্টারমশাই হেসে বললেন, 'হ্যাঁ বৌদি, জিল্ আপনার আগেই ফার্স্ট এইড দিয়ে দিয়েছে।'

মাস্টারমশাই, দিদি আর আমি মিলে ববির লোম কেটে ফেলে আয়োডিন ঢেলে ছোরার কাটাটা বেঁধে ফেললাম। কাটাটা খুব গভীব নয় ভাগ্যিস। তবু ভয়ের কারণ আছে।

ববি কিছু আপত্তি করল না। বরং আমাব হাত চেটে দিল একটু। জিল্ আর ডায়ানা দেখলাম আমার ঠিক পেছনে বসে কুঁই-কুঁই করে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

মাস্টারমশাই হেসে উঠে বললেন, 'আহা, বেচারীদেব অধিকার কেড়ে নেওয়ায় ওরা কাঁদছে।'

টিন-টুট আর মা-খিন ঘুমচোখে এসে হাজির। পাড়ার বোধহয় সবাই এসে পড়েছে। চোর দুটোকে মারতে চাইছে অনেকে।

টিন-টুট তার বাবাকে বলল, 'দাও না বাবা ও বেটাকে একটা চড় লাগিয়ে। আমার সুটকেশ চুরি করেছিল মনে নেই?'

মা-খিনও আলিজানের হাত ধরে বায়না জুড়ল, 'আব্বা, ওরা তো

আমাদের বস্তিতে সেদিন চুরি করেছিল না? মারবে না ওকে? আর ববিকে কি করেছে দেখ — ইস্! খুন বেরিয়েছে কতখানি!'

আলিজান মা-খিনকে কোলে নিয়ে বলল, 'সাহেব শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।'

জেফরসন মাস্টারমশাইকে গম্ভীর মুখে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমি থানায় খবর দিয়েছি। রাত্তিরে বাড়ি পাহারা দেবে আর এদের নিয়ে যাবে।'

জেফরসন এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দিদিকে হেসে বললেন, 'মিসেস চৌধুরী, ববি দুষ্টু হলেও মাঝে-মাঝে ভালো কাজ করে — নয় কি? মিনি কি বল?'

আমি তো গর্বে কথাই বলতে পারলাম না। দিদি শুধু একটু লজ্জা-লজ্জা করে হাসল।

এগিয়ে এসে জেফরসন ববির কানের পাশের লোমে হাত বুলিয়ে, ডায়ানা আর জিল্-এর গলা চুলকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন সব ব্যবস্থা করে ফেলতে।

যেদিন ফেরার কথা ছিল তারও দুদিন পরে জামাইবাবু ফিরলেন। সমস্ত শুনে ঘর ফাটিয়ে হেসে বললেন, 'আরে বেজায় একটা মজার অ্যাডভেনচার থেকে বাদ পড়ে গেলাম শেষে আমি! চিড়িয়াখানা বল আর যাই বল, আমার এ-সংসারে চোর-ছ্যাঁচোড়ের জায়গা নেই। অ বীণা! মাস্টারকে আরো কিছু মালপোয়া ভেজে খাওয়াও।'

মাস্টারমশাই ক্ষীণ স্বরে যা বললেন বোঝা গেল যে ঐ কদিন দিদির পাল্লায় পড়ে বেশি খেয়ে ওঁর পেটের অবস্থা কাহিল। জামাইবাবু আর এক দফা হা-হা করে হাসলেন।

হাসি থামতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ববি কই?'

গেলাম সবাই ববির কাছে। তখন সে চোখ বুজে শুয়ে রূপীকে দিয়ে গায়ের পোকা বাচাচ্ছে। দেখে জামাইবাবুর আর এক দফা কি হাসি!

— এগারো —

মা-খিনকে নিয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছি। ভারি মন খারাপ। ববির হাতের ঘা সেরে গিয়েছে বটে কিন্তু ও যেন কিরকম নির্জীব হয়ে পড়ছে। খেলা করে না, খালি চুপ করে শুয়ে-শুয়ে নিশ্বাস ফেলে আর ভাবে। তাছাড়া ওকে কিনে নেবার জন্যে দালালরাও খুব যাওয়া আসা করছে। জামাইবাবু কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। ববিকে বিক্রি করার ব্যাপারে এখন আর কারুরই তেমন উৎসাহ নেই। তবু হিংস্র জন্তু যদি একবার খেপে যায় তো মানুষ মেরে ফেলতে কতক্ষণ! চোরগুলোকে তো আর একটু হলেই টুকরো-টুকরো করে ফেলত।

আগে ববিকে বিক্রির ব্যাপারে যার সব চাইতে উৎসাহ ছিল সেই আবদুলই এখন খানিকটা বেঁকে বসেছে। বলে, 'ববি তো শেব-কা-বাচ্চা। ও কভি নিমকহারামী করবে না।'

যাই হোক, সব মিলে আমার মেজাজটা একদম খারাপ। এলোমেলো হাঁটছি। কানে এল – 'মিঁ-মিঁ-মিঁউ।' ভারি দুর্বল ছোট্ট গলায় মিষ্টি একটুখানি ডাক। তাকিয়ে দেখি আমার পাশেই রাস্তার ধারে, আধ বিঘৎ লম্বা, সিকি বিঘৎ উঁচু একটা বেড়ালছানা ঠকঠক করে কাঁপছে। গায়ের লোম এখানে-ওখানে ওঠা-ওঠা। কিন্তু কি যে মিষ্টি মুখখানা! দিদি শুনলে বলত, 'আহা, বেড়ালের মুখ আবার মিষ্টি হল? হাসালি মিনি!'

বাঁ-হাতের চেটোর ওপর ওকে ঘাড় ধরে তুলে এনে বসিয়ে মা-খিনকে বললাম, 'বেচারী! ওর মা নেই রে। চ. ওকে বাড়ি নিয়ে যাই।' এরকম কুড়িয়ে-কুড়িয়ে দিদির সংসারে কুকুর-বেড়ালের সংখ্যা আমি আসার পর বেশ একটু বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু ফেলে দেওয়া যায় কি! বিশেষ করে এরকম তুলতুলে বাচ্চা একে তার মা নেই!

বাড়ির দিকে রওনা হয়ে মা-খিনকে বললাম, 'ওর নাম থাক তুতুল্।'

মা-খিন ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ডাকল--'আয় আয় তু-তুল্, তুল্‌তুল্ —'

বিরক্ত মুখ করে ববি শুয়ে ছিল ওর বাসার সামনে। ববি আজকাল কি প্রকাণ্ড যে হয়েছে! বাইরের লোক ওকে দেখলে রীতিমতো ভয় পায়।

ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বাচ্চাটাকে ফ্রকের কোঁচড় থেকে বার করে ওর নাকের কাছে রাখলাম। ববি বিতৃষ্ণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু ঐটুকু জীব হলে কি হয়, তুতুল্ তৎক্ষণাৎ সজারুর মতো লোম খাড়া করে ডোঙ্গা হয়ে উঠল। মুখে ফ্যাঁ-ফ্যাঁ করে হরেক রকম শব্দ করতে-করতে ও হঠাৎ দিল এক লাফ — ঠিক ববির নাকের সামনে।

তারপর যা হল দেখলে তোমরা তাজ্জব বনে যেতে। ইয়া দৈত্যের মতো কালো মিশমিশে ববির সামনে সিকি-বিঘৎ উঁচু তুতুল্, থাবা তুলে ফ্যাঁস করে এগিয়ে পেছিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ঠাস-ঠাস করে ববির নাকে চড় মারছে!

ববিও এসব কল্পনাও করতে পারেনি। একটু যেন অপ্রস্তুত মুখেই ছানাটা সত্যি বেড়াল না মুরগি তাই বোধ হয় পরখ করার জন্যে ববি ওর মোটা থাবাটা বাড়িয়ে তুতুল্‌কে দুবার নাড়াচাড়া করল। আর সঙ্গে-সঙ্গে

দেখলাম তুতুল্ চিতপটাং হয়ে চোখ বুজে হাত-পা ছুঁড়ে অজ্ঞান মতো হয়ে গেল। ববির নাড়াচাড়াটা নিশ্চয়ই একটু জোরে হয়ে গিয়েছিল। ববির মুশকিল হচ্ছে যে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সে মোটেই সঠিক খবর রাখে না।

মা-খিন আর আমি অনেক রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম তুতুলের। গরম দুধ দিলাম চামচে করে খেতে। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে ন্যাকড়ার সল্‌তে পাকিয়ে সেটা দুধে চুপিয়ে ওর মুখে গুঁজে দিলাম। তুতুল্ চুকচুক করে টানতে লাগল।

ওর মুখে সল্‌তে ধরে আমি আর মা-খিন এমন মশগুল হয়ে গল্প শুরু করেছিলাম যে লক্ষ্যই করিনি কখন সল্‌তেটা টেনে-টেনে তুতুল্ সব ন্যাকড়াটাই গিলে ফেলেছে।

যখন খেয়াল হল ভয়ে আমাদের হাত-পা হিম। তুতুল্‌কে তুলে দেখলাম ওর পেটটা ছোট্ট একটা পুঁটলীর মতো বড়ো হয়ে উঠেছে! তুতুল্ থাবা চেটে-চেটে ঘুমের ব্যবস্থা করতে লাগল। আর আমরা হায়-হায় করে ভাবতে লাগলাম — এখন কি হবে!

দুদিন ধরে আমরা আঁতকে-আঁতকে তাকাতে লাগলাম তুতুলের দিকে - কখন পেট ফেটে মরে ছানাটা! চারদিনের দিন দেখি ও বেশ নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে। পেটটাও বেশ নরম-নরম। আর শুনলে অবাক হবে, তুতুল্ অতখানি ন্যাকড়া খাবার পরও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই খাওয়া-দাওয়া করছিল। এমন কি আজ দেখলাম অন্য বড় বেড়ালদের পায়ে-পায়ে ঘুরে-ঘুরে কখনো ল্যাং মারার চেষ্টা করছে, কখনো বা ল্যাজ ধরে 'রশি টান' খেলছে।

ববিকে দেখে আজ অবাক হয়ে গেলাম। কি রকম নেতিয়ে পড়ে

আছে। খাবার একটুও ছোঁয়নি পর্যন্ত। উ-বা-স আর আবদুলকে ডাকলাম, 'ববির বড্ডো অসুখ করেছে। কিচ্ছু খাচ্ছে না, নড়ছেও না।'

উ-বা-স যেই ববির চেনে হাত দিয়েছে অমনি একটা চাপা গোঙানি বেরুল ববির গলা থেকে। গলার কাছটায় হাত দিয়ে উ-বা-স আঁতকে উঠল, 'আরে একি?' আবদুলও পরীক্ষা করল। ববি এত তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়েছে যে ওর গলার চেনের ওপর দিয়ে মাংস গজিয়ে একটা সাংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

ভয়ে আমি প্রায় কেঁদে ফেলে বললাম, 'তাহলে কি ববি মরে যাবে?'

আবদুল জোর দিয়ে উত্তর করল, 'মরবে কেন? আপ্‌রেশান করলে সব আচ্ছা হয়ে যাবে।'

দিদি, জামাইবাবু, জেফরসন সবাই খবরটা শুনে আপশোস করতে লাগলেন। ঠিক হল ভালো একজন ডাক্তার আজই ডাকা হবে। তারপর দেখা যাক কি দাঁড়ায়। আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললাম, 'ববিকে বাঁচাতেই হবে।'

সায় দিয়ে আবদুল বলল, 'আলবৎ বাঁচবে ববি।'

ডাক্তার বদ্যি, গরমজল, ছুরি, কাটাকুটি নিয়ে দুটো দিন হু-হু করে কেটে গেল। গলার চারধার অসাড় করে নিয়ে যখন ডাক্তারবাবু কাটলেন, আমাকে আর দিদিকে ওরা ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। বড়োরা সবাই চোখ বড়ো-বড়ো করে ঘিরে বসে রইলেন। পুরো আধঘণ্টা দিদি আর আমি চমকে-চমকে উঠে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলাম সিঁড়ির পাশের বারান্দায়। আর দু-মিনিট অন্তর 'হয়েছে? এখনো হয়নি?' বলে ওঁদের অস্থির করতে লাগলাম।

ববি মরফিয়ার ঘোরে ঝিমিয়ে ছিল। সন্ধ্যে নাগাদ একটু দুধ খেল

আমার হাত থেকে। সবাই বলল এটা নাকি খুব একটা ভালো লক্ষণ।

মাস্টারমশাই সাতদিনের ছুটি দিয়েছিলেন আমায়। কেননা ববি আমার কথা ছাড়া কারুর কথাই গ্রাহ্য করে না। তার ওপর এখন ও সম্পূর্ণ ছাড়া থাকে। গলার ঘা একেবারে না-শুকোনো পর্যন্ত ওকে চেনে বাঁধা যাবে না।

সাতদিনেই ববি এমন চাঙ্গা হয়ে উঠল যে ঘা শুকোবার আগেই ওর শয়তানি শুরু হয়ে গেল। সেদিন তুতুল্‌কে বাগানে ছেড়ে দিয়ে ঘুঁটি খেলছি মা-খিনের সঙ্গে, ববি হঠাৎ এক লাফে ওর বাসা থেকে বেরিয়ে এসে আমায় খেলার ছলে গড়িয়ে ফেলে দিয়ে চেরি গাছটায় উঠে বসে রইল। অনেকদিন পরে মনে হল যেন ববি হাসছে। ঘাড়টা এমন করে নাড়াচ্ছে মনে হচ্ছে ও বলতে চায় —আচ্ছা, দেখা যাবে!

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ববি কিচ্ছু লণ্ডভণ্ড করল না, ভাঙল না, ছিঁড়ল না। কিরকম হাবাটে হাসি-হাসি মুখে খানিকক্ষণ পরে না-ডাকতেই নেমে এল। এসে তুতুল্‌কে ভিজে নাকে একটু নাড়া দিতেই সে যেই ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে ওকে চড় মেরেছে, অমনি একটু সরে গিয়ে চোখটা ঘুরিয়ে একবার দেখে নিয়ে গোদা-গোদা পা ফেলে ববি ঢুকলো ওর বাসায়।

আমি তো বেজায় অবাক! ববি কি তবে সত্যিই এতদিনে মানুষ হল?

— বারো —

কয়েকদিন পরে। অসাবধানে ববির বাসার দরজাটা বন্ধ করেছি। ওকে এখনো চেনে বাঁধা হয় না। গলার চামড়া নরম আছে। অথচ সেরে উঠেছে

বলে দরজায় ছিটকিনি দিতে হয়। অন্যমনস্ক হয়ে ছিটকিনি আটকাতেই ভুলে গিয়েছি।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। আমি ডায়নাকে সামনে রেখে গাড়ি-বারান্দার নিচে 'এক্কা-দোক্কা' খেলছি। ডায়না যেন কতই বুঝছে! ঘুঁটি ফেলা দেখছে, আমার লাফানো দেখে উসখুস করছে।

হঠাৎ দেখলাম ববির বাসার দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ববি তীরের মতো বেরিয়ে এসে আধা-অন্ধকার মাঠ থেকে কি একটা শাদা মতো তুলে নিয়ে ঘাড়ের কাছে রাখল। ছুটে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ববির ঘাড়ের ওপর শাদা মতন ওটা —তুতুল্। গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। দেখতে-না-দেখতে জবাগাছের বেড়া টপকে ওরা অন্ধকারে কালোয়-কালোয় মিশে গেল।

ব্যাপারটা এমন তাড়াতাড়ি ঘটল যে আমি কিছুক্ষণ তো কিছু করতেই পারলাম না। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলাম। ছুটোছুটি, খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। আবদুল, উ-বা-স, জেফরসন, জামাইবাবু—সবাই শলা-পরামর্শ করে বেরিয়ে পড়লেন খুঁজতে। জ্যাক্ আর জিল্‌কে ওঁরা সঙ্গে নিলেন। আমি কান্না জুড়ে দিলাম 'যাব' বলে, ওঁরা কিছুতেই রাজী হলেন না।

রাত প্রায় বারোটা নাগাদ জামাইবাবু ফিরে এসে বললেন, 'নাঃ, পাওয়া গেল না। আবদুল এখনো হাল ছাড়েনি। আর সবাই ফিরে এসেছে। এবার যদি ওটাকে পাওয়া যায় তো তক্ষুনি বিক্রি করে দেব।'

কথাটা বলে জামাইবাবু আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। কিন্তু তাকালেও বেশ বোঝা গেল যে জামাইবাবুও ববিকে বেশ একটু ভালো-বেসে ফেলেছেন।

কেঁদে-কেঁদে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। পিকপিক পাখির ডাকের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি আবছা অন্ধকার। ভোরের প্রথম চিহ্ন ফুটেছে আকাশের গায়ে।

বিছানা ছেড়ে তড়াক করে দরজার কাছে গেলাম। বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল দিয়ে পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম।

হাত পোঁছয় না বলে একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে দাঁড়িয়ে খিড়কির দিকের বড়ো দরজাটা খুলে বাইরে আসতেই আমাদের চিড়িয়াখানাটা চোখে পড়ল। কুকুরগুলো আড়ামোড়া খাচ্ছে। তারা আমাকে দেখেই ল্যাজ নেড়ে কুঁই-কুঁই করে দরজা খুলে দেবার আবেদন-নিবেদন জানাতে লাগল। আমি রড্-এর ফাঁকে হাত দিয়ে ওদের নাক ঘষে দিয়ে আদর করলাম।

রূপী কিচকিচ করে লাফালাফি জুড়ল ঘুম ভেঙেই। ওকে বললাম, 'জানিস রূপী, ববি নেই।'

রূপী মাথা ঝাঁকাতে লাগল। বললাম, 'খুঁজতে যাচ্ছি।'

ও হাত বাড়াল। হাতটা ধরলাম। নরম-নরম হাত। ঠিক একটা বুড়ো-মানুষের মতো। ইচ্ছে হল ওকে ছেড়ে দিই। এমন মানুষের মতো জানোয়ার পোষা ভালো নয়। ঠাকুমা শুনলে রাগ করবেন। কিন্তু রূপীর হাত ধরে আমার কেন জানি না ঠাকুমার জন্যে মন কেমন করে উঠল।

বাঘারা রাত-পাহারার কুকুর। ছাড়া থাকে। ওদের দল বেঁধে আমায় অভ্যর্থনা করতে আসতে দেখে বুঝলাম এখন না-গেলে আর যাওয়াই হবে না।

খিড়কির গেটের দিকে এক পা এগিয়েছি, পেছন থেকে তারস্বরে ডাক শুনলাম, 'গেল, গেল, পালাল, পালাল - ' না-তাকিয়েই বুঝলাম
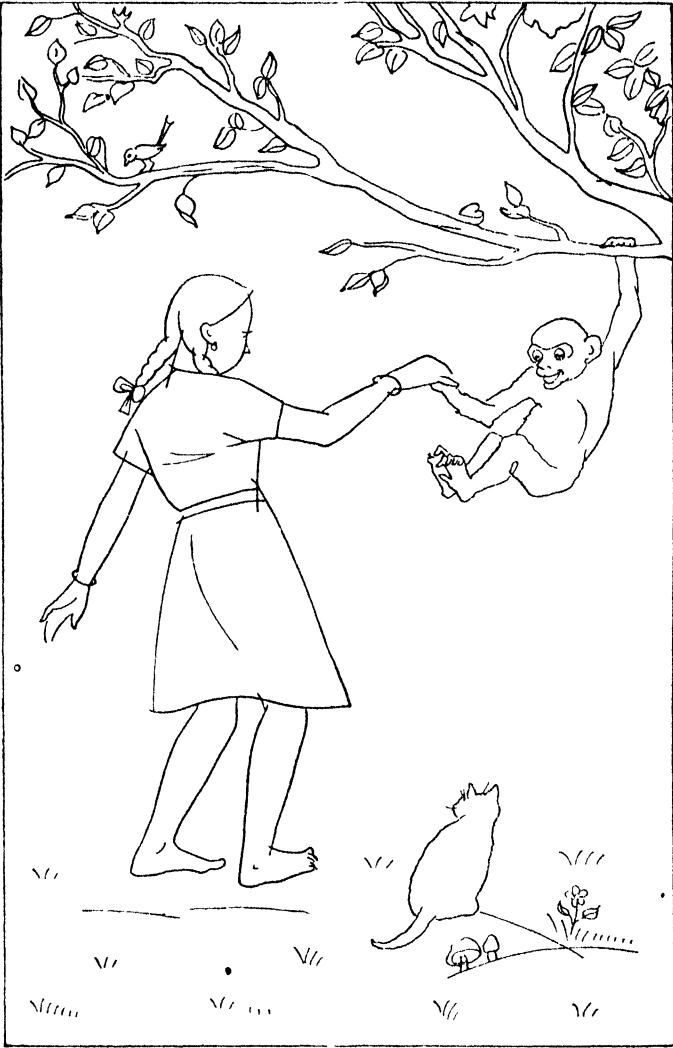
পিয়া আর লিয়া আমার পেছনে লেগেছে। ধুনিটাও ওর খাঁচার মধ্যে কক্-কক্ করে ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। ওর হাঁসের বাচ্চাটা বেশ একটা বড়োসড়ো প্যাঁক-প্যাঁকে হাঁস হয়ে যাওয়ায় তাকে পাশে আলাদা খাঁচা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে ডাক শুনে তারও গলা খুলে গেল। ডানা ঝাপটে প্যাঁক্-প্যাঁক্-প্যাঁক্ করে নাচ জুড়ল বাচ্চাটা।

ওদের খাঁচার ধারে বুলা আর বুলোর খাঁচা দেখলাম বেজায় সরগরম। বুলাদের পাঁচটা বাচ্চা পেঁজা তুলোর মতো ছোট্ট-ছোট্ট নরম গা আর চুনির মতো লাল-লাল চোখ নিয়ে ভোরের খেলা শুরু করে দিয়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের একটু আদর করতে। কিন্তু আমার যে বড্ড তাড়া। ববি আর তুতুল্ নেই। ওদের খুঁজে বের করতে হবে।

গেট খুলে বেরিয়েছি, শুনতে পেলাম পিয়া আর লিয়া বলছে, 'আরে বাবা, পালাল — পালাল! পাখি সব করে রব! রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ! তবে রে লক্ষ্মীছাড়া সুধীর! —' এত হাসি পেল যে একা-একাই হাসতে হল।

মা-খিনদের ছোট্ট চালাঘরখানার জানলায় গিয়ে ডাকলাম, 'মা-খিন —'

আলিজান ধড়মড়িয়ে জেগে উঠল, 'একি মিনিমিসবাবা, এত ভোরে?'

'মা-খিনকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব। জামাইবাবু বলেছে সকালে উঠে রোজ বেড়াতে যেতে।'

আলিজান দরজা খুলে আমার চোখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'মিসবাবা, তোমার অন্য মতলব নেই তো?'

আমি বললাম, 'দূর্! জিগগেস করে দেখ।'

মা-খিনকে নিয়ে এক ছুটে গেলাম টিন-টুটদের বাড়ির পাশের

গলিতে। টিন-টুটদের একতলা বাড়ি। এদিকের জানলার ধারে টিন-টুট শোয়। শিস দিয়ে-দিয়ে ডাকলাম, 'টিন-টুট, টিন-টুট—'

তিনজনে মিলে যখন খোঁজা শুরু করলাম তখন বেশ ফরসা হয়ে গিয়েছে চারধার। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। খালটা পেরিয়ে যাব কিনা ভাবছি হঠাৎ জামাইবাবুর বন্ধু দত্তদের ফলের বাগানের ভেতর থেকে চেনা-চেনা গলার আওয়াজ কানে এল। মনে হল আবদুলের গলা। কাকে কি যেন খুব রসিয়ে-রসিয়ে বলছে। আবদুলের গলা অত হেসে-হেসে কথা কইছে! ব্যাপার কি?

একটু এগিয়ে গিয়ে যা দেখলাম তাতে তিনজনেরই চক্ষু ছানাবড়া। আবদুল ঘাসের ওপর বসে কথা বলছে, হাসছে আর ম্যাঙ্গোস্টিন ফলের কোয়া বের করে খাচ্ছে। ওর সামনে দু-পায়ের ওপর ভর দিয়ে ববি থপথপিয়ে বসে কতোই যেন মন দিয়ে শুনছে। ওদের পায়ের কাছে ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে তুতুল্। মুখে একটা মরা চড়ুইপাখি।

আবদুল হাসছে! আবদুলও হাসে তাহলে?

শুনলাম আবদুল বলছে, 'আরে তুল্‌তুলিয়া, তুই একটা নেড়ি বিড়াল আছিস, তুকে তো বহুৎ পেয়ার করে সব্ কোই! ঘর্ চল্ ইয়ার!'

আমাদের দেখতে পেয়ে আবদুল খুশ মেজাজে হাঁকল, 'আরে মিস-বাবা, আপকা ববিকে মিলে গিয়েছে। তুতুল্ ভি। বকশিশ দিতে হোবে। আচ্ছাওয়ালা বকশিশ।'

ববি আমাদের দেখে বোঁ-বোঁ করে কয়েকবার ঘুরে নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এল। আর সঙ্গে-সঙ্গে তার উচ্ছ্বসিত ধাক্কা আমার চোখে সরষেফুল ফুটিয়ে ছাড়ল। ধাক্কা সামলে আমি ববির গলা জড়িয়ে কানের কাছে

একটা চুমোই খেয়ে ফেললাম। তুতুল্‌কে বুকের মধ্যে মরা চড়ুই সুদ্ধু তুলে নিয়ে আদর করে-করে অস্থির করে ফেললাম। আবদুলকে বললাম, 'তুমি বাড়ি যাও আবদুল, আমরা একটু পরেই আসছি।'

আবদুল বলল, 'আমার সঙ্গে যাতে হোবে।'

আমি রুখে বললাম, 'আমি যাব না। ব্যস!'

আবদুলের হাসি-হাসি মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি নোকরি ছেড়ে দেব। বিবিকে লিয়ে মেমিও চলে যাব সায়েবদের নাচ দেখাতে।'

শুনে আমি নেচে উঠলাম, 'আমায় নেবে?'

এবার আবদুল একটু হাসল। বলল, 'পাগল!'

জিগগেস করলাম, 'কেন?'

আবদুলের মুখখানা কিরকম ফ্যাকাশে আর অন্যরকম হয়ে গেল। খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ভেবে বলল, 'মিসবাবা, তোমার মতো আমার একঠো লেড়্‌কি ছিল। বহুৎ খুপ্‌সুরৎ লেড়্‌কি। আমার সাপ ধরা বেওসা ছিল। একদিন লেড়কিকে লিয়ে গিয়েছিলাম সাপ ধরতে। সাপ লেড়কিকে কেটে দিল। ব্যস্‌। আমার জিন্দগী একদম খতম হোয়ে গেল।'

আবদুল আর কিচ্ছু বলল না। তারপর চলে যেতে-যেতে ঘাড় না-ঘুরিয়েই শুধু বলে গেল, 'বিবির গলামে রশি বাঁনে রেখেছি। ওঠো পাকড়ে লিয়ে জল্‌দি ঘর চলে আসবে মিসবাবা।'

আবদুলের কথা শুনে আমার মায়ের জন্যে মনকেমন করে এমন কান্না পেয়ে গেল কি বলব। চোখের ধারটা চিনচিন করে উঠে গলায় ব্যথা ধরিয়ে দিল।

মা-খিন্ আর টিন-টুট এসব কথা কিছুই বোঝেনি। ওরা তুতুল্‌কে নিয়ে খেলা জুড়ে দিয়েছে মহানন্দে।

ববি কি মনে করে ওর হতকুচ্ছিত ভিজে নাকটা আমার গালে ঘষে দিয়ে আমার গা ঘেঁষে বসল। আমি গালটা মুছতে-মুছতে চোখ কুঁচকে টিন-টুটকে বললাম, 'চ, আমরা পালাই।'

টিন-টুট অবাক হয়ে জিগগেস করল, 'পালাব কেন রে?'

আমি গম্ভীর মুখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম। খানিকক্ষণ ভাবার পর বললাম, 'জানিস্ টিন-টুট, ববিকে নিয়ে বাড়ি গেলে এবার ওরা বোধহয় বিক্কিরি করে দেবে। যদি দু-একদিন পালিয়ে থাকি আর প্রমাণ দিতে পারি যে ববি আর বুনো নেই তাহলেই শুধু ওকে রাখা হবে। ববিকে সবাই ভালোবাসলেও খুব ভয় পায় রে। ববি দুষ্টু কিনা।'

ওরা মাথা নেড়ে সায় দিল। কিন্তু কোথায় পালানো যায়? সবাই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম—কোথায় পালাই?

— তেরো —

অনেক তক্ক-টক্ক করে ঠিক হল যে টিন-টুট আর মা-খিন তুতুল্‌কে নিয়ে এখন ফিরে যাবে। আমি ববিকে নিয়ে শহরতলীর জঙ্গলের ধারে যে ভাঙা প্যাগোডার একটা স্তূপ আছে সেখানে বিকেলবেলা অপেক্ষা করব। ওরা গিয়ে ভান করবে যেন আমি হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ায় ওরা ঘাবড়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়ির সবাই যখন খুঁজতে বেরুবে তখন ওরা উল্টো দিকের পথ বাতলে দেবে। যাতে খুঁজে-খুঁজে কেবল হয়রান হয় জামাইবাবুরা। কিন্তু বিকেলের আগেই ওরা চুপি-চুপি রওনা হয়ে পড়বে

আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। তারপর আমরা তিনজন আর ববি মিলে দুদিন বনে-বাদাড়ে ঘুরে, ফলমূল খেয়ে কাটাব। খুঁজে-খুঁজে দুদিন পরে ওরা যখন হাল ছেড়ে দেবে তখন আমরা সদলবলে ফিরব। কি মজা যে হবে!

টিন-টুট খুব ওস্তাদ ছেলে। রাস্তাঘাট সব আমায় ঠিক করে বুঝিয়ে দিয়ে তুতুল্‌কে নিয়ে ওরা বাড়ির দিকে রওনা হল। আমি বলে দিলাম ওরা আসার সময় যেন কিছু খাবার-দাবার আনে।

টিন-টুটের দেখানো পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। অত বড়ো একটা ভাল্লুক নিয়ে আমায় এই সাত সকালে যেতে দেখে অনেকেই অবাক হয়ে দেখতে লাগল। আমি ববিকে ধরে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলাম পাছে কেউ চিনতে পারে, কিম্বা কথা বলতে চায়।

বেশ খানিকটা হেঁটে যাবার পর শহরতলীর জঙ্গলের গায় এসে পড়লাম। পায়ে চলার পথের রেখা পেয়ে বড়ো রাস্তা ছেড়ে আমরা সাঁ করে সেটা ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবে হাঁপ ছাড়লাম। বাবাঃ, পালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়!

খানিকটা হেঁটে যেতে লক্ষ্য করলাম বাঁ-হাতে সেই ভাঙা প্যাগোডা। আরো একটু এগিয়ে পাহাড়ি জমির গায়ে চোখে পড়ল বেশ খোঁদল মতো একটা গর্ত। ঠিক করলাম এখানেই থাকব এ দুটো দিন। শুকনো পাতা-টাতা কুড়িয়ে ঘরের মেঝে বানিয়ে একটা ভাঙা ডাল মাটিতে গুঁজে নিয়ে বললাম, 'ববি, এটা হল আলনা। রাত্তিরে ওরা এলে তুই পাহারা দিবি, আমরা ঘুমুব। আলনায় আমাদের জামা-কাপড় থাকবে। পাহারা দিবি তুই। বুঝলি?'

ববি মোটেই বুঝতে চাইল না। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে এখানে-ওখানে ঘুরে

বেড়াতে লাগল। হঠাৎ দেখলাম আমি একদম একা। বুকটা ভয়ে ধড়াস করে উঠল। ববি কি তাহলে পালিয়েছে? ওকে ছেড়ে রাখা ভালো, না বেঁধে রাখা ভালো?

ভাবতে-ভাবতে চেয়ে দেখি গর্তের মধ্যে পাতার বিছানায় ববি হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। ধড়ে প্রাণ এল! ববিটা আশ্চর্য কিন্তু! বাড়িতে ওকে যেমনি বন্য লাগে, বনে ওকে তেমনি সভ্য মনে হচ্ছে। যদি বাঘ-টাঘ আসে তো ও মনে হয় টেনে দৌড় মারবে যতক্ষণ না ওর বাসায় পেঁছয়।

পেটের মধ্যেটা হঠাৎ কুঁই-কুঁই করে ডায়ানার মতো ডেকে উঠল। বেজায় খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। অথচ বিকেলে সেই ভাঙা প্যাগোডার কাছে ওরা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করবে বলে কথা দিয়েছে। এখন তো সবে সকাল। বিকেল হতে ঢের-ঢের দেরি।

ববির গলার দড়িটা একটানে খুলে নিয়ে নিজের কোমরে জড়িয়ে রাখতে-রাখতে বললাম, 'ববি, তুই এখন স্বাধীন। আমিও স্বাধীন। চল্ খাবার খুঁজি গে।'

জায়গাটা পাছে পরে চিনতে না-পারি তাই বিনুনী থেকে লাল রিবন দুটো খুলে নিয়ে আড়াআড়ি করে একটা গাছে টাঙিয়ে রাখলাম। দূরে থেকেও যাতে চোখে পড়ে।

দড়ি খুলে দিলাম বটে কিন্তু ববি আমায় ছেড়ে তো গেলই না বরং আমার পাশটিতে যেন লেগে রইল।

খুঁজতে-খুঁজতে একটা লাল ফলের গাছ দেখতে পেলাম। ভারি গোল-গোল রসে চপচপে বলে মনে হল। হাত বাড়ালাম। সঙ্গে-সঙ্গে ধাঁ করে একটা চড় মেরে ফলের ওপর থেকে ববি আমার হাত সরিয়ে দিল।

ভীষণ রাগ হল আমার। চট করে আর একটা ফল তুলতেই ও গোঁ-গোঁ করে গর্জন করে উঠল।

ববি কেন ওরকম করছে বুঝলাম না। এক কামড় দিলাম ফলটায়। একদম তেতো। থু-থু করে ফেলে দিতে না-দিতেই গা পাকানো শুরু হল। বিষফল নয় তো? কি ভাগ্যিস খাইনি। ওহো, ববি তাহলে আমায় এইজন্যেই বারণ করছিল কি!

মাথাটা ঝিমঝিম করতে আরম্ভ করেছে। ববির গলা ধরে এগোলাম খানিকটা। সামনের আঁশফলের গাছটা পেরিয়েই যে জলাটা — সেটা পর্যন্ত যেতেও আমার শরীর খারাপ লাগছিল। আমি জলার দিকে এগোচ্ছি দেখে ববি এক লাফে আঁশফলের গাছটায় চড়ে বসল। আমি মাথা চুবিয়ে, মুখে-চোখে জলের ছিটে দিতে লাগলাম। জলার ধারেই চোখে পড়ল একটা চেরিগাছ। পাকা চেরিতে আলো হয়ে আছে।

অনেকবার কুলকুচো করে-করে ফলের গন্ধটা মুখ থেকে চলে যেতেই শরীরটা যেন একটু ঝরঝরে লাগতে লাগল। জল তেষ্টা পেয়েছিল। মুখ নিচু করে খেতে গিয়ে দেখি জলে পোকা কিলবিল করছে। কিন্তু উপায় কি? বনবাস করতে হলে এক-আধটা পোকা খেতে হবে না?

কুকুরের মতো জলে মুখ লাগিয়ে জল খেতে বেশ লাগল। ডায়ানা দেখলে ভারি খুশি হত। ভাবত আমি জাতে উঠে কুকুর হয়েছি!

চোখ বুজে জল খাচ্ছিলাম, কেননা পোকাগুলো নাকের কাছে এমন ভাবে ঘোরাঘুরি করছিল যে চোখ খুলে রাখলে ওদের মিছিল করে মুখের মধ্যে মার্চ করে যেতে দেখতে পেতাম।

শরীরটা এতক্ষণে বেশ ভালো লাগছে। চেরিগাছের সামনে থেকে 'ববি, ববি' করে ডাকতেই ও তরতর করে নেমে এসে আমার সঙ্গে

সমান তালে চেরি খেতে শুরু করে দিল। কচমচ করে খেয়েই চলেছি দুজনে। পাড়ছি, খাচ্ছি আবার পাড়ছি। টকমিষ্টি চেরি, খেতে বড় ভালো লাগছে।

পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে হাত বাড়িয়ে এক গোছা চেরি একটু উঁচু একটা ডাল থেকে পাড়তে গিয়েছি, কি যেন ফোঁস-ফোঁস করে উঠল। তাকিয়ে যা দেখলাম—চোখে সরষেফুল! একটা মস্ত বড়ো সাপ ফণা মেলে আমার সামনে দুলছে। তার পেটের অর্ধেকটা মাটিতে ঠেকে। বাদ বাকি অংশ হাওয়ায় কাঁপছে।

কাঠ হয়ে গেলাম। চোখের পলক পর্যন্ত ফেলতে সাহস হচ্ছে না। অনুভব করলাম ববি ঠিক আমার পেছনে। সেও তাকিয়ে আছে মনে হল। কেননা সেও একেবারে স্থির হয়ে আছে বুঝলাম। সাপটাও স্থির। পাতায়-পাতায় এমন একটা শব্দ হচ্ছে যে গায়ের লোমগুলো হাওয়া-লাগা কদমফুলের মতো কাঁপতে লাগল।

তারপর কি যে হল জানি না। একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি এক ধারে ছিটকে পড়লাম। কানে এল ফোঁস্-ফোঁস্, গোঁ-গোঁ গর্-র-র শব্দ। মাথা তুলে দেখি ববি দু-হাতে চড় মারছে সাপটাকে। গোড়ায় সাপটা দু-একটা চড় সামলে রুখে উঠবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ববির প্রচণ্ড চড়ের সামনে তার মস্ত চক্কর-কাটা ফণাটা নেতিয়ে পড়ল। ববি পা দিয়ে দলে-দলে সাপটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে ভিজে নাকে এসে আমায় পরীক্ষা করতে লাগল। নাকটায় মনে হল সাপের বিষ লেগে আছে! ভয়ে, ঘেন্নায়, মাথার মধ্যেটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরে উঠল।

অনেকক্ষণ উঠতেই পারলাম না। বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল অনবরত। চোখ বুজতে ভয় হচ্ছিল। কেননা বুজলেই দেখছিলাম সামনে ফণা তুলে

নাচছে সাপটা। আর সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠছিল, কাঁপুনি আসছিল।

উঠে দাঁড়াতেই বুঝলাম ভীষণ জ্বর আসছে। চোখ জ্বালা করে জল পড়ল কয়েক ফোঁটা। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। তারপর হি-হি করে জ্বর এসে গা যেন ঝলসে দিয়ে গেল।

এদিকে আকাশের অবস্থাও ক্রমে খুব খারাপ হয়ে উঠল। একদল পাগলা হাতির মতো রাশি-রাশি মেঘ হাঁ-হাঁ করে আকাশ ছেয়ে ফেলল। কড়াৎ-কড়াৎ মেঘের হুঙ্কারে, ছোট্ট বাচ্চার মতো ভয় পেয়ে ববি কাঁপতে-কাঁপতে আমার গা ঘেঁষে বসল। বুঝলাম ওর ভাল্লুকে-জ্বর এসেছে। কিন্তু আমারও কেন ভাল্লুকে-জ্বর এল! ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম দুজনে গলা জড়াজড়ি করে বসে।

কাঁপুনি কমে এলে আমরা সামনের পায়ে চলার পথ ধরে এগিয়ে চললাম। ববির জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো জ্বলে-জ্বলে এখন কি রকম ঘোর হয়ে আছে।

সাঁ-সাঁ হাওয়ার সঙ্গে নানা পাখি আর জন্তুর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। ববির গায় হাত দিয়ে চলেছি আমি। পাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ও কখনো দু-পায়ে, কখনও চার-পায়ে চলেছে। চোখগুলো গুলি ভাঁটার মতো ঘুরছে। দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে ববি যেন হাবা হয়ে গিয়েছে।

বেশ ঠাণ্ডা মাথায় দেখে-শুনে পথ চলতে শুরু করেছিলাম। যেদিকে আমাদের লাল রিবন বাঁধা বাসাটা আর প্যাগোডাটা ফেলে এসেছিলাম, সেদিক বরাবরই হাঁটতে শুরু করেছি। অথচ হাঁটছি তো হাঁটছিই। যেদিকেই ফিরছি অচেনা লাগছে। কোথায় যেতে কোথায় যাচ্ছি! সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। লাল ফিতে বা ভাঙা প্যাগোডার কোনো চিহ্নই

নেই। শুধু গাছ আর গাছ, পাতা আর পাতা। শুধু মেঘের ডাক আর পাখির ডাক! সাঁই-সাঁই করে ঝোড়ো হাওয়ার দাপাদাপি দেখতে-দেখতে বেজায় কান্না পেয়ে গেল।

কিন্তু কিছুতেই পথ খুঁজে পেলাম না।

আকাশ ভেঙে এবার বৃষ্টি নামল। ভগবান যেন হোসপাইপ্ দিয়ে পৃথিবীকে চান করাচ্ছেন। এত জোর বৃষ্টি যে গায়ে ফুটতে লাগল।

কাঁপতে-কাঁপতে ঝড়ের মুখের দিকে পিঠ করা একটা পাথুরে গর্তের খোঁদলে ঢুকে আমরা দু-বন্ধুতে গলাগলি হয়ে বসলাম। ববি যে মানুষ নয় তা কিন্তু আমি যেন ভুলেই গিয়েছি। ববির খসখসে লোমের স্তূপের পেছনে বসে আমি খালি কেঁপে-কেঁপে উঠছি। ববি ঘাড় ঘুরিয়ে নাক ঘষে-ঘষে মাঝে-মাঝে আমায় ভরসা দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। কতক্ষণ জানি না। কিন্তু অনেকক্ষণ মনে হচ্ছে। বৃষ্টি থামার সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়ার হুল্লোড় বেড়েছে। আমার কিরকম বেহুঁশ লাগছে। সবই যেন ছায়া-ছায়া। চোখ খুলে রাখলে মনে হচ্ছে ঘুমুচ্ছি। চোখ বন্ধ করলে মনে হচ্ছে তাকিয়ে আছি। শুধু এইটুকু পরিষ্কার অনুভব করতে পারছি যে ববি আমার পাশে আছে।

হঠাৎ এলোমেলো চিন্তার মধ্যে কার গলা শুনতে পেলাম যেন। খুব চেনা গলা, কিন্তু দূর থেকে। মনে হল বাবা যেন 'মিনি, মিনি' করে ডাকছেন। তারপর মনে হল ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেকগুলো গলা আমায় ডাকছে, 'মিনি, মিনি, মি — নি — '

একটু পরে আমার চারধারে অনেকগুলো গলার স্বর আর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সাড়া দিতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ববির লোমে মাথা রেখে চোখ বুজে পড়ে রইলাম শুধু।

কে যেন আমায় কোলে তুলে নিচ্ছে! ভারি কান্না পাচ্ছে তো! কিচ্ছুই যে বুঝতে পারছি না। শুধু চোখ দিয়ে হু-হু করে জল পড়ছে।

— চোদ্দ —

কিচির-মিচির কিচির-মিচির চড়ুইপাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি আমি আমার ঘরে শুয়ে। রোদে জানলার ওপর বসে একদল চড়ুই দারুণ ফুর্তিতে চেঁচামেচি করছে।

মাথার কাছে দেখলাম বাবা বসে আছেন। তাকাতেই বাবা লাফিয়ে উঠলেন, 'কি রে জেগেছিস? কেমন লাগছে?'

সব মনে পড়ে গেল একটু-একটু করে। চিঁ-চিঁ করে উত্তর দিলাম, 'ভালো আছি।'

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। একটু উসখুস করে নড়েচড়ে শুয়ে বাবাব চোখের দিকে চেয়ে খানিকটা ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করলাম, 'ববি?'

'আছে, আছে। সে যাবে কোথায়!'

কয়েকদিন ধরে আমার চিকিৎসা চলল। শুয়ে-শুয়ে নানা কথা শুনতে পেতাম। বাবা, জামাইবাবু, উ-বা-টিন-সাহেব, দিদি, এমন কি জেফরসন পর্যন্ত এসে অনেকক্ষণ আমার ঘরে বসতেন। আগের মতো আজকাল আর কেউ কথায়-কথায় হাসাহাসি ঠাট্টা তামাশা করে না।

শুনলাম যুদ্ধ নাকি বেধে গিয়েছে। বাবার আপিস সবসুদ্ধ কলকাতায় বদলি হয়েছে। প্রবাসীদের এখন দারুণ বিপদ। আর এক-দিনও থাকা উচিত নয়। সাহেবরা তো প্লেনকে প্লেন ভাড়া করে সব

নিরাপদ জায়গায় ছেলেমেয়ে আর বউদের পাঠিয়ে দিচ্ছে। বেটাছেলেরা কেউ-কেউ যুদ্ধে যাচ্ছে, কেউ-কেউ যাচ্ছে না। অনেক বাঙালীও ইতিমধ্যে নাকি পাততাড়ি গুটিয়েছে।

বাবা একদিন কথাটা পাড়লেন, 'দেখ প্রতুল, মিনি তো সেরে উঠছে, এবার আমাদের রওনা হতে হয়। আমার আপিস থেকে মাত্র সাতদিনের ছুটি দিয়েছিল। তাও অনেক বলে-কয়ে। ইচ্ছে ছিল সব একসঙ্গে যাব। তা তুমি তো রাজী হলে না। তোমরা পরেই এস। আমি মিনিকে নিয়ে চললাম।'

কথাটা শুনে জামাইবাবু ভীষণ আপত্তি তুললেন, 'বলেন কি? দেখছেন সিভিল লাইনস্ --এরই কি অবস্থা! ট্রেনে রেঙ্গুন পর্যন্ত ও রোগা মেয়ে পৌঁছবার আগেই মরে যাবে। এখনো তো সময় আছে হাতে। ও আরো একটু ভালো হোক। কথা দিচ্ছি ও ভালো হলেই আমরা সব একসঙ্গে সোজা কলকাতা চলে যাব।'

জেফরসন, উ-বা-টিন-সাহেব সবাই বোঝালেন। কিন্তু বাবা নাছোড়-বান্দা। শেষে অবশ্য জামাইবাবুই জিতলেন। উকিল হওয়ায় বাবাকে কথার পাকে-পাকে এমন পেড়ে ফেললেন যে বাবা মত না দিয়ে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

যাবার সময় বাবা রীতিমতো কেঁদেই ফেললেন। দিদি প্রায় চেঁচিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। আমারও খালি-খালি দু-চোখে জল এল।

বাবার যেদিন রেঙ্গুন ছাড়ার কথা তার দিন চারেক পরে বেঙ্গুনে বোমা পড়ল। আমি তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছি। দেখলাম সমস্ত শহরটা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। হুটোপুটি, দাপাদাপি, ঠেলাঠেলিতে রাস্তা চলা যায় না। সবাই কোনো-না-কোনো

দিকে ছুটছে। হয় তাদের জিনিসপত্র মাথায় চড়িয়েছে কিম্বা গাড়িতে। অনেকে এমনভাবে ছুটেছে যে মনে হয় যেন বোমা এই তাদের মাথায় টিপ করে কে ফেলল বলে!

কিছুদিন ধরেই ব্ল্যাক-আউট আর সাইরেনের জ্বালায় সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এখন সারাক্ষণ ব্ল্যাক-আউট আর সাইরেন, ট্রেঞ্চে ছোটা আর ভঁয়ে নীল হয়ে থাকা।

দিদির মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। ঊর্মিলা ঝির পাড়া-কাঁপানো কান্না বোধহয় জাপানীরাও শুনতে পেয়েছিল, 'হাই মা রে, বিদেশে বিভূঁয়ে আমার কি হল গো-ও-ও-ও'—

জামাইবাবুর মুখ পর্যন্ত কালো মেঘের মতো থমথমে হয়ে উঠল। কিন্তু কেন জানি না, আমার একটুও ভয় করছিল না।

কোঁয়া-কোঁয়া-কোঁয়া শব্দে সাইরেন বাজার সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ কালো করে এল জাপানী সূর্য-আঁকা উড়োজাহাজ। দুম্! দুম্!! দুম্!!

বোমা পড়ছে তো পড়ছেই। জাপানীরা কি পাগল হয়ে গিয়েছে? থামছেই না বোমা পড়া। বাড়ি, ঘর, বাগান, জমি সব কাঁপছে।

আমরা সবাই ছুটোছুটি করছি কিন্তু ট্রেঞ্চে যেতে পারছি না। জন্তু-গুলোকে খাঁচায় বন্ধ করে রেখে যাব কি করে আমরা? কি করুণ গলায় যে ওরা কাঁদছে!

শেষে জ্যাক্, জিল্, বাঘা, ডায়না আর রূপীকে খুলে আমাদের সঙ্গে নেওয়া হল। ববিকে নিতে দিল না ওরা। কেননা ও ভয়ে কিরকম বন্য মুখ করে বসে থাকায় কেউ সাহস করল না কাছে যেতে। ট্রেঞ্চের দিকে ছুটতে-ছুটতে কানে এল টিয়া দুটো উত্তেজিত হয়ে চেঁচাচ্ছে আর বলছে —'ধর-ধর-ধর, চোর-চোর—'

অসুখের সময় টিন-টুট আর মা-খিন রোজ আমাকে দেখতে আসত। এখনো এত গণ্ডগোলের মধ্যেও ওদের আসার বিরাম ছিল না।

আজ 'অল ক্লিয়ার' সাইরেন বাজার একটু পরেই হাঁপাতে-হাঁপাতে টিন-টুট এল, 'চৌধুরীসাহেব, বাবা আপনাকে বলতে বললেন যে আমরা আজই সবাই গাঁয়ে চলে যাব। একবার যদি আসতে পারেন তো বড়ো ভালো হয়।'

কারুরই এ সময়ে বাড়ি ছেড়ে যাবার মতো মনের অবস্থা নয়। তবু জামাইবাবু ওদের বিদায় জানাতে গেলেন—অনেকদিনের বন্ধু, হয়তো জীবনে আর দেখাই হবে না।

আমি টিন-টুটকে কি বলব ভেবে না-পেয়ে আমার সব চাইতে ভালো গুলতিটা ওর হাতে গুঁজে দিলাম। একটাও কথা বলতে না-পেরে টিন-টুট ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে ছুটে চলে গেল ওদের বাড়ির দিকে।

জামাইবাবু সবে ফিরেছেন, হঠাৎ হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে এল মা-খিন—'বাবা মরে গিয়েছে, বাবা নড়ছে না—'

দিদি আর জামাইবাবু আমাকে আবদুলের জিম্মায় রেখে জেফরসন আর উ-বা-সকে নিয়ে ছুটলেন মা-খিনদের বাড়ি।

অনেকক্ষণ পরে ওঁরা যখন ফিরলেন বুঝলাম আলিজান সত্যিই মারা গিয়েছে। বোমা পড়ার সময় বাইরে বেরিয়েছিল। একটা স্প্লিন্টার ছিটকে এসে সোজা ওর বুকে ঢুকে যায়। বুঝলাম, যে বোমাটার শব্দে আমাদের খাবার ঘরের বাসন-কোসন ঝনঝনিয়ে উঠেছিল সেই বোমার স্প্লিন্টার লেগেই আলিজান মরেছে। মা-খিনও মরত। ট্রেঞ্চের কোণে লুকিয়ে থাকায় এ যাত্রা বেঁচে গিয়েছে।

মা-খিন আর কাঁদছে না। হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। অনেক আদর-টাদর

করে ভুলিয়ে দিদি ওকে খাওয়াল। আমি কি বলব ভেবে না-পেয়ে চুপটি করে ওর পাশে বসে রইলাম। আমিও আর ভালো করে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

আবদুল গিয়ে জেফরসনকে ডেকে আনল। জামাইবাবুরা অনেকক্ষণ আলোচনা করলেন যাবার ব্যাপার নিয়ে। উ-বা-স আর আবদুল উবু হয়ে বসে রইল কাছে। উ-বা-স ওদের গ্রামে চলে যাবে আমরা রওনা হলেই। ঠাকুর ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে। ঠিক ছিল সুধীর আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে। ঊর্মিলাও।

জামাইবাবু হঠাৎ টেবিলে এমন জোরে একটা থাপ্পড় মারলেন যে চমকে উঠে শুনলাম উনি বলছেন, 'জানিস আবদুল, এ মুলুক আমার। হলামই বা জাতে বাঙালী। কিন্তু এখানে আমি পয়দা হয়েছি। এ মুলুক আমার মা। তবু ছেড়ে যেতেই হবে — আমার কিচ্ছু হবে না আর। জীবনে আর কিচ্ছু করতে পারব না আমি।'

কথাগুলো শুনে বুকটা আমার দুরদুর করে উঠল। জামাইবাবুরা সবাই কিরকম হয়ে গিয়েছে। সারা শহর জ্বলছে। মানুষ মরছে তো মরছেই। জামাইবাবু এবার একটু ঠাণ্ডা হয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'কুকুর বেড়াল পাখিগুলোকে বনে ছেড়ে দিয়ে আসি গে।'

কিন্তু যাবেন কি করে? রাস্তায় লাইন করে গাড়ি চলেছে। সে লাইন শেষই হয় না। চলে ঠিক পিঁপড়ের মতো আস্তে-আস্তে।

তবু জেফরসন-এর আর আমাদের জন্তু আর পাখি সব এক জায়গায় জড়ো করা হল। শুধু কয়েকটা কুকুর বেছে রাখলেন জেফরসন। শেষ পর্যন্ত উনি যেতে রাজী হলেন না। বললেন, 'আমি কোথায় যাব? বিলেতেও যুদ্ধ, এখানেও যুদ্ধ। মরি এখানেই মরব। তোমাদের পেঁছে

দিয়ে এসে শহরতলীতে উঠে যাব। তোমাদের জ্যাক্, জিল্, বাঘা আর ডায়ানাকে আমায় দিয়ে যাও। ওদের রাখব। অন্য সব জন্তুদের বনে ছেড়ে দিয়ে আসতেই হবে। নয়তো বোমায় সবকটা মরবে।'

আমি কেঁদে ফেলে বললাম, 'আঙ্কল জেফরসন, ববিকে তুমি রাখ।'

জেফরসন আমাকে বুকে টেনে নিয়ে একটু আদর করে কিরকম অদ্ভুত ভাঙা গলায় বললেন, 'মিনি ডিয়ার, যুদ্ধ বড় নিষ্ঠুর। তোমায় এত ভালোবাসি, কিন্তু তোমার ববিকে আমি নিতে পারব না। ও যে হিংস্র জন্তু। ওকে বনে ছেড়ে দিতেই হবে।' শুনে আমি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করতেই মা-খিন আমার সুরে সুর মেলাল।

টিয়া দুটোর খাঁচার দরজা খুলে জামাইবাবু শুনলাম ডাকছেন, 'পিয়া, লিয়া, আয় আয় যাঃ, উড়ে চলে যা। বনে চলে যা—'

পিয়া আর লিয়া খাঁচা থেকে এক-পা দু-পা বেরিয়ে এসে চোখ পিট-পিট করে চাইল। তারপর চোঁ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে দাঁড়ের ওপর থেকে ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'না-না-নাঃ— '

আজ পর্যন্ত কক্ষনো জামাইবাবুর চোখে আমরা জল দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। ঢোক গিলে বললেন, 'উড়ে যা বলছি—যাঃ—'

কিন্তু খোলা খাঁচা থেকে এক-পা বেরুল না পিয়া আর লিয়া।

ঠিক হল পরদিন ভোরবেলা আমরা বনের পথ হয়ে যাব উড়োজাহাজ ছাড়বার জায়গায়। যাবার পথে জন্তুগুলোকে বনে ছেড়ে দেব। জিনিসপত্র কিচ্ছু নেওয়া যাবে না। শুধু মানুষগুলো নেবে উড়োজাহাজ। এসব উড়োজাহাজও নাকি আর বেশি দিন চলবে না। এর পর যেতে হলে হেঁটে যেতে হবে। এ শহরে মানুষ বাস করতে পারবে না। কারণ জাপানীরা নাকি বলেছে—ম্যান্ডালেকে তারা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।
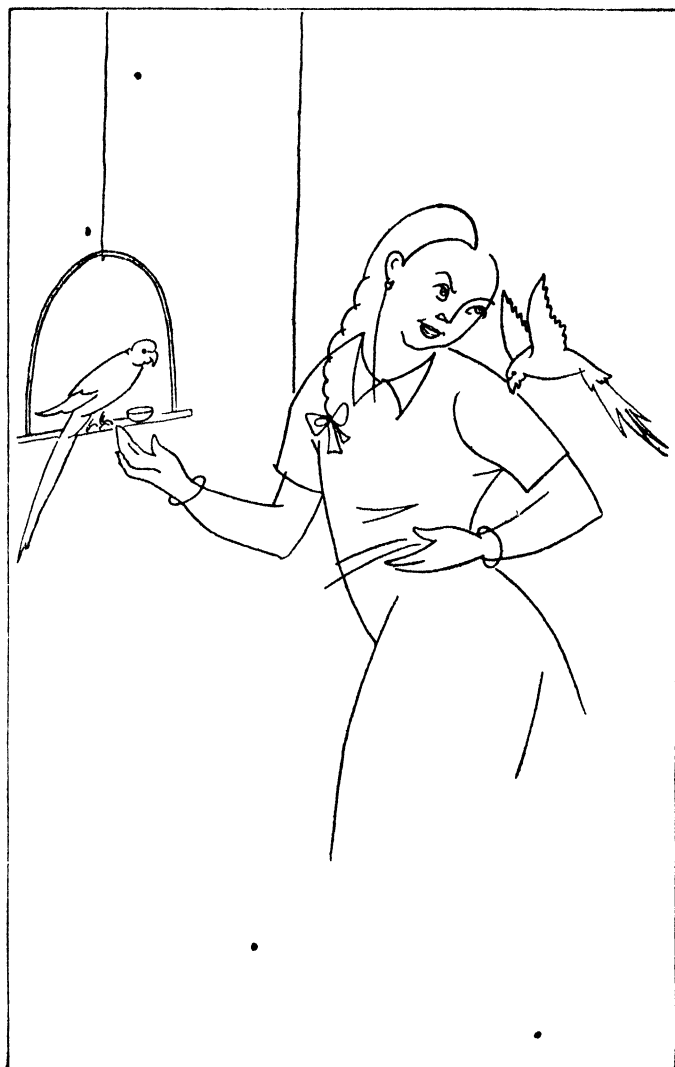
মা-খিন যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। দিদি আর জামাইবাবুর মেয়ে হিসেবে ওর টিকিট কেনা হয়েছে। দুনিয়ায় ওর কেউ নেই তো! কোথায় ফেলে যাবে ওকে? দিদি এসব কথা বলছে আর চোখ মুছছে।

দেখে ঊর্মিলাদি সুর তুলে কাঁদছে।

— পোনেরো —

সারা রাত জেগে খেটেখুটে আবদুল আর উ-বা-স একটা খাঁচাগাড়ি বানিয়েছে। সব জন্তু-জানোয়ার ধরে, এরকম লম্বা একটা খাঁচাগাড়ি।

ভোর রাতে শেষবারের মতো জন্তুগুলোকে খেতে দিয়ে, তাদের খাঁচায় গাদাগাদি করে ভরা হল। ববিকে আমি নিজের হাতে খাওয়ালাম। আগ্রহ করে ও খেল। আমার হাত চেটে দিতে-দিতে হঠাৎ মুখ চেটে দিল একবাব। কান্না চাপতে ডাকলাম, 'ববি!' ববি গায়ের কাছে ঠেসান দিয়ে বসল।

জ্যাক্, ডায়ানা, জিল্ আর বাঘাকে জেফরসন-এব বাড়ি পাঠাবার সময় আমরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। ওরা কি যেন কিসের আশঙ্কায় কেঁও-কেঁও করে চেঁচাতে লাগল। এমন কি জ্যাক্ পর্যন্ত তার জার্মান ট্রেনিং ভুলে বাঘার মতো নোঁড় বনে গেল।

খাঁচায় ববি উঠল সব শেষে। আবদুল, জেফরসন-এর সঙ্গে আমাদের পেঁছে দিতে যাচ্ছে। ও ববিকে এক থাবড়া মেবে আদর করে বলল, 'ববি, তুর দেশমে তুকে দিয়ে আসব আজ।'

জন্তুগুলোর চোখের দিকে আমরা আর চাইতে পারছি না। জামাইবাবু ওদের খাঁচায় একটা বড়ো ঢাকা দিয়ে দেবাব হুকুম দিয়ে বললেন, 'এবার রওনা হতে হবে। কখন যে ঠিক জায়গায় পেঁছব কে জানে!'

জেফরসন-এর গাড়ি আর আমাদের গাড়িতে ঠেসাঠেসি করে সবাই উঠে বসলাম। ঠিক সেই শিকারে যাবার দিনের মতো। অথচ কি তফাত সেদিনে আর এদিনে!

আমাদের গাড়ির পেছনে খাঁচাগাড়িটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্তই তৈরি। গাড়িতে স্টার্টও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। ভিটেমাটি ছেড়ে যাচ্ছেন জামাইবাবু কিন্তু চেয়েও দেখছেন না। চাইতে পারছেনই না।

গাড়ি ছাড়তেই মা-খিন ডুকরে কেঁদে উঠল। দিদি ঘন-ঘন চোখ মুছতে শুরু করেছে। ঊর্মিলাদি তো ইতিমধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছে দু-একবার। জামাইবাবু হঠাৎ শুকনো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অসহ্য!'

ঘণ্টায় পাঁচ মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়েও অনেকবার থামতে-থামতে তবে আমরা শহরতলীতে পেঁছিলাম। বিকেল তখন প্রায় চারটে হবে। সারাটা দিন সবাই বলতে গেলে না-খেয়ে আছে।

চারদিকে কেবল ভাঙা বাড়ি আর জ্বলন্ত বাড়ি দেখতে-দেখতে খিদে-তেষ্টা কারুরই বিশেষ ছিল না। দিদি কেবল মা-খিনকে কোলে নিয়ে বসে ব্যাগ থেকে কি বের করে খাওয়াচ্ছিল। আমাকেও খেতে বলছিল। কিন্তু আমি কি করে খাব? আমি তখন কেবল ভাবছি— বন এগিয়ে আসছে, ববি চলে যাবে।

গাড়ি থামল। অন্ধকার মুখে জামাইবাবু গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। খাঁচাগাড়িটা আলগা করে দিল উ-বা-স আর আবদুল।

জামাইবাবু গাড়ির উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় হাঁকলেন, 'ওদের ধরে-ধরে বনে ছেড়ে দিয়ে এস।'

সে যে কি মর্মান্তিক চিৎকার শুরু হল যদি শুধু শুনতে! ওরা সবাই কাঁদছে। এমন কি খরগোশগুলো পর্যন্ত। সবাই পেছিয়ে রয়েছে। খাঁচা

থেকে কেউ বেরুতে চায় না। তুতুল্টা পর্যন্ত রয়েছে। শাদা দুধে ধোয়া এতটুকু তুতুল্! তাকেও ছেড়ে যেতে হবে। তাকেও বনে যেতে হবে। মানুষ কি নিষ্ঠুর। যুদ্ধ কি সাংঘাতিক!

ধরে-ধরে একে-একে বেশির ভাগকে পাচার করে দিল ওবা দুজনে মিলে। জেফরসন আর আমাদেব কতদিনের পোষা সব জন্তু আর পাখি! কত ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করা সব জীব!

রূপীকে ধরা এক হাঙ্গামের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আবদুল ডাকল, 'চৌধুরীসাহাব, আপনি ধরুন।'

কিন্তু চৌধুরীসাহেব মুখ ফেরাতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'আঃ, তুমি ধরে দিয়ে এস না।'

অনেক কষ্টে রূপীকে ধরে দূরে একটা গাছের ডালে তাকে বসিয়ে দিয়ে এল। পিয়া আব লিয়া রূপীর পাশে বসে চেঁচাতে লাগল, 'না — না না!' তুতুল্, পুষু, ম্যাঁম্যাঁ, রুশি সবাই কাঁদছে - মিঁউ-ম্যাঁও কবে।

সব শেষে এল ববির পালা। কি আশ্চর্য লম্বা চওড়া হয়েছে ববিটা! কালো বুকের ওপর সেই শাদা 'ভি'-টা একটা চ্যাটালো রিবনের মতো দেখাচ্ছে। বিজয়ী বীরের বুকেব মেডেলের ফিতের মতো।

এক মুহূর্ত ভুলে ছিলাম যে ববির সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

উ-বা-স এক টান দিল ববির গলার চেনটা ধরে। গোঁ-গোঁ করে প্রতিবাদ জানিযে চোখ ঘোরাতে লাগল ববি। কিছুতেই এক চুল কেউ ববিকে নড়াতে পারল না। জামাইবাবু, জেফরসন, শেষ পর্যন্ত দিদি পর্যন্ত টানাটানিতে যোগ দিল। কিন্তু ববি যেন নিশ্চল পাথর বনে গিয়েছে।

শেযে নাচার হয়ে জামাইবাবু বললেন, 'মিনির কথা শুনবে।' বলে আমার হাতে চেনটা তুলে দিলেন।

ভেবে দেখ, ববিকে বনে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আমার হাতে চেন তুলে দিলেন! তবু আমি শক্ত হয়ে শুকনো চোখে ববিকে ডাকলাম, 'ববি আয়!'

সঙ্গে-সঙ্গে ববি চলতে শুরু করল। শুধু চলা নয় ছুটতে শুরু করল। হিড়হিড় করে আমায় টেনে নিয়ে চলল বনের দিকে। ওরা সবাই আমার পেছু নিলেন—ববি পাছে কিছু করে বসে।

বনের মুখে এসে চেনটা খুলে দিয়ে বললাম, 'ববি বনে চলে যা—যা বনে চলে!' জামাইবাবুর মতো করে বললাম কথা কটা—শুকনো, ভারি গলায়। ববি এক পা-ও নড়ল না। আবদুল ওকে চলে যেতে বলল। সবাই বারবার অনুরোধ করলেন। কিন্তু ববি স্থির, নিশ্চল।

ওঁরা গাড়ির দিকে ফিরে চললেন। বললেন, 'থাক্ এখানে দাঁড়িয়ে। বেজায় দেরি হয়ে গিয়েছে। আর অপেক্ষা করা যায় না।'

গাড়িতে পেঁছে দিদি ডাকল, 'মিনি, চলে আয়।'

জামাইবাবু ডাকলেন, 'আয়, ফিরে আয়, মিনি।'

আমি নড়তে পারলাম না। কি রকম মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম!

আবদুল ভিজে গলায় বলল, 'মিসবাবা গাড়িতে ফিরে যাও। আমি ধরছি। চেনটা দাও আমায়।'

আমার যেন জ্ঞান ফিরে এল। আবদুলকে চেনটা দিয়ে নিজের গলার থেকে সোনার হারটা খুলে নিয়ে ববির গলায় পরিয়ে দিলাম।

ববি তার ভিজে নাকটা ঘষে-ঘষে আমার হাতটা ভিজিয়ে দিল।

আমি আর তাকালাম না। পেছন ফিরে ছুটে চলে গেলাম গাড়িতে। চোখের জল আর বাধা মানছে না। গাল বেয়ে টপ-টপ করে পড়ছে।

আবদুলের ইশারা পেয়ে আমাদের গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া হল। ছুটে চলন্ত গাড়িতে গিয়ে উঠল আবদুল।

ঝ্ঁকে দেখলাম ববিও ছুটতে আরম্ভ করেছে। আর এমন সাংঘাতিক স্পিডে ছুটছে যে এখুনি আমাদের ধরে ফেলবে!

ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলি, 'বাক্-আপ্ — ববি!'

কিন্তু হঠাৎ দেখলাম দুখানা গাড়িই থেমে গিয়েছে।

জামাইবাবু চিৎকার করে জেফরসনকে বলছেন, 'ওকে গুলি কর জেফরসন!'

ববি আমাদের প্রায় ধরে ফেলেছে। এদিকে জেফরসন পিস্তল তুলে তাগ করছেন।

দূর থেকে সূর্যের আলো পড়ে ওর গলার হারটা জ্বলে উঠল দেখলাম।

আমি আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম — 'না, না, না — '

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল আবদুল!

'না সাহাব,' বলে পিস্তল চেপে ধরল।

জেফরসন ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতেই ও বলে উঠল, 'মাফ্ কিজিয়ে, সাহাব। আমি নোক্রি আর করব না। আপনার বহৎ নিমক খেয়েছি। মাফ্ করবেন। আমি ববির ভার লেবো। মাফ্ কিজিয়ে।'

এবার আবদুল আমার দিকে একবার তাকাল। কৃতজ্ঞতায় আমার কথাই ফুটল না মুখে।

আবদুল হেসে বলল, 'মিসবাবা, ববির জন্যে দিল খারাপ কোরো না।'

ইচ্ছে হল আবদুলকে গলা ধরে একটু আদর করতে। ছোটবেলায় বাবাকে যেমন করতাম। আবদুলের মেয়ে যেমন আবদুলকে করত।

কিন্তু আবদুল দাঁড়াল না। সেলাম ঠুকে ছুটতে আরম্ভ করল।

আবদ্দুলকে ছ্টতে দেখে ববি আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। একট্ কি যেন ভাবল। তারপব দ্-হাত তুলে আকাশেব দিকে তাকিয়ে একটা ডাক ছেড়ে বোঁ কবে ঘ্বে দ্-পাযে তবতর কবে বনেব দিকে ছ্টতে থাকল।

দ্ব থেকে আমাব সোনাব হাবটা ওব কালো গলায় আবার ঝকঝক করে উঠল।

আবদ্ল চলল ওব পেছনে-পেছনে। কিন্তু ববি ধবা দিল কিনা, আব আবদ্ল ওকে ধবতে পারল কিনা তা বোঝাব আগেই বন ওদেব ঢেকে নিল।

— শেষ —

সেযুগে বনের পশুপক্ষী যেমন ভালোবাসতো শকুন্তলা, তেমনি এযুগে আমাদের মিনি। তবে মিনির ভালোবাসায় ভাগ বসাতে ছিল আরো হরেক রকম প্রাণী – টিয়া খরগোশ, বাঁদর বেড়াল, আর কুকুরই ছিল চোদ্দটি। মিনির বয়েস বারো, দেশ ছেড়ে আছে বর্মায় সাইরেন শোনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। এমনি সময় একদিন শিকারে গিয়ে মিললো ছোট্ট ভাল্লুক রবিকে — পাঁচ-মাসের বাচ্চা, সদ্য মা হারিয়ে এমন হিংস্র যে ভয়ংকর [illegible] অন্ত নেই, তবু এই জীবটিকে মানুষ করবার ভার নিল মিনি। কী অপূর্ব কৌশলে এই বন্দি শেষ পর্যন্ত বশ মানলো। ক্রমে ক্রমে সবার ভালোবাসা আদায় করে নিল [illegible] – তারই কাহিনী রবির বন্ধু।

লেখিকার সরস সরল ভঙ্গি [illegible] বন্য পশুপক্ষীর এমন জীবন্ত চরিত্ররচনা গভীর মমতার [illegible] অকপট প্রকাশ–সংগ্রামসাহিত্যে [illegible] দেখা যায় না। [illegible] ছোটদের নয় বড়-দেরও মুগ্ধ [illegible] দিন পাবেন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবির বন্ধুর ছবি এঁকেছেন হৈমন্তী সেন। লেখিকার মতো ইনিও নতুন, ছোটদের জন্য এ প্রথম ছবি আঁকলেন। এঁর সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় চিত্ররেখায় অসীম সম্ভাবনার পরিচয়।